

# বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

দার রাহে হাক প্রকাশনীর লেখকবৃন্দ

বিস্মিলাহির রাহমানির রাহিম

## ভূমিকা

‘দার রাহে হাক’ নামক প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িকীর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের যবনিকাপাত ঘটেছে। এ দুটি পর্যায় সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্রাকারে মহানবী (সা.)- এর জীবনেতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। আর সেই সাথে অনর্থক ও অসার বাক্যবান ও ইসলামের শত্রুদের ও প্রাচ্যবিদদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত বাক্যালাপের জবাবে শত সহস্র খণ্ড অনুলিপি বিনামূল্যে সমস্ত ইরান ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিতরণ করা হয়েছে।

এখন ঐ সাময়িকীর সমষ্টিকে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হবে, যাতে পাঠক বন্ধুগণ একটি ছোট পুস্তিকা, অথচ মহানবী (সা.)- এর জীবনেতিহাসের প্রামাণ্য চিত্র হাতের নাগালে পেতে পারেন। আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এ পুস্তকের বিষয়বস্তু বিশ্বস্ত সূত্র থেকে ইতিহাসের উপর বিশেষ গবেষণার মাধ্যমে সংকলন করা হয়েছে এবং আমরা আশা করি সর্বস্তরের পাঠকবৃন্দের জন্যে তা স্বার্থক ও আকর্ষণীয় হবে।

এ পুস্তকের বিষয়বস্তু ও ‘দার রাহে হাক’ নামক ইসলামী সংস্থার অন্যান্য সাময়িকী সম্পর্কে আপনাদের পরামর্শ, সমালোচনা ও মতামত সানন্দে গৃহীত হবে। পরিশেষে আপনাদের মত বন্ধুবর ও মুসলমান ভাইদের সহযোগিতা ও সহায়তায় বৃহত্তর ক্ষেত্রে এ ঐশী উদ্দেশ্যের পথে সাফল্য লাভ করতে পারব বলে আশা করি।

লেখক পরিষদ

দার রাহে হাক

## ইসলাম পূর্ব বিশ্ব

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে সারা বিশ্বের মানুষ বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনাগত দিক থেকে এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছিল। যদিও বিশ্বের সর্বত্র একই অবস্থা বিরাজমান ছিলনা তথাপি সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, বিশ্বের সকল মানুষ চিন্তাগত বিচ্যুতি, কুসংস্কার ভ্রান্ত সামাজিক রীতি-নীতি, অলীক ও অবাস্তব কল্পনা এবং সামাজিক ও নৈতিক অনাচারের ক্ষেত্রে পরস্পরের অংশীদার ছিল।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ইহুদীরা হযরত মূসা (আ.)-এর দীনকে পরিবর্তন করেছিল; বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনা মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করেছিল। পরিতাপের বিষয় হলো খ্রিস্টবাদ, যা কলুষতা থেকে মানুষের চারিত্রিক সংযম ও আত্মার পবিত্রতার জন্যে এসেছিল (এবং এর প্রবর্তক হযরত ঈসা (আ.) মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন) ধর্মগুরু পাদ্রীদের মাধ্যমে তা স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে পরিবর্তিত রূপ লাভ করেছিল এবং অধিকাংশ খ্রিস্টান ধর্ম গুরুদের জন্যে তা ব্যবসায়িক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

অনুরূপ যেহেতু পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নীতিমালা বিবর্জিত হয়ে পড়েছিল, সেহেতু মানুষের সার্বিক মুক্তি ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অক্ষম ছিল।

এরই ফলশ্রুতিতে, বিশ্বের সকল মানুষ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক রীতি-নীতি, সামাজিক ও চারিত্রিক অনাচারের ক্ষেত্রে পরস্পরের অংশীদার হয়েছিল।

অন্যায় ও অত্যাচারের দাবানলে মানুষ জ্বলছিল... কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতি তথাকথিত দীন ও ধর্মরূপে মানুষের উপর রাজত্ব করত; একাধিক (কল্পিত) খোদার উপাসনা, ত্রিত্ববাদ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল; অনুরূপ অধিকাংশ মানুষ মূর্তি, অগ্নি, গরু ও নক্ষত্র পূজায় নিয়োজিত ছিল। সবচেয়ে লজ্জাকর ছিল নর ও নারীর লজ্জাস্থান পূজার প্রচলন। আর এ ধরনের অনাচার এবং চারিত্রিক ও আত্মিক বিচ্যুতিই, যা সমস্ত বিশ্বকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলেছিল এবং মানব

সমাজের বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তির কারণ হয়েছিল। নর হত্যা, হানাহানি অন্যায়, অত্যাচারে নিমগ্ন হয়ে গিয়েছিল সারা পৃথিবী। বস্তুত মানবতা বিপন্ন অবস্থায় পতিত হয়েছিল!

## ইসলামের আবির্ভাবের প্রাক্কালে আরব ভূ-খণ্ড

‘পোড়ামাটি’ বলে পরিচিত আরবে তখন এক অদ্ভুত পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। অসমতল প্রান্তর, বালুকাময় উপত্যকা ও টিলাময় এ ভূমির নাম ছিল আরব। ছিল না পানি, ছিলনা কোন বৃক্ষরাজি; তীক্ষ্ণ কণ্টকময় বুনো বৃক্ষকে সেথায় বৃক্ষ বলা হতো; গৃহগুলোকে যদি গৃহ বলা হতো তবে তা ভুল হতো; ক্ষুদ্রাকার কুটিরগুলোতে মানুষ নামক কিছু অস্তিত্ব বসবাস করত; আর পচা দুর্গন্ধময় খোরমা ও পানি দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করত। আন্তর্গোত্রীয় যুদ্ধ-বিগ্রহ আরবের সামাজিক নিয়ম রীতিতে পরিণত হয়েছিল। মক্কা মূর্তির বাজার বৈ কিছুই ছিল না। এ উপদ্বীপের অধিবাসীরা ছিল বনিক ও সুদ-খোর। তারা দেহহাম ও দিনারের বিনিময়ে মানুষের জীবন ক্রয় করত!

মরু প্রান্তরের যাযাবর জীবন, পশুপালন ও রাখালী আর সার্বক্ষণিক রক্তারক্তিতে আরব উপদ্বীপের মানুষের জীবন বিপর্যস্ত ছিল। ...শাসক শ্রেণী ও মুনাফাখোরদের শোষণ থেকে উৎসারিত অর্থনৈতিক দুরাবস্থা জীবনের অর্থকে ব্যাহত করেছিল এবং সৌভাগ্যের দিগন্তে আঁধার নেমে এসেছিল।

সুদখোর ধনি ও বনিকশ্রেণী, যারা মক্কায় ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল অবৈধ পথে বিপুল পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হয়েছিল। তারা সমাজের বঞ্চিত ও দুর্বল শ্রেণীর উপর শোষণ ও নিপীড়ন চালাত। প্রকৃত পক্ষে সুদ ও অন্যায়ভাবে মুনাফা অর্জনের ফলে সমাজে মানবতাবিবর্জিত শ্রেণী বৈষম্য তুঙ্গে উঠেছিল।

আরবের গোত্রগুলো অজ্ঞতাবশতঃ তদানিন্তন সময়ে প্রকৃতিপূজা ও মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল এবং কাবাগৃহ আরবের মূর্তিঘরে পরিণত হয়েছিল।

আরবের প্রচলিত চারিত্রিক অবক্ষয়মূলক নিয়ম ও নিকৃষ্টতম সামাজিক কুসংস্কারের যে কোনটিই কোন একটি জাতির সমৃদ্ধির শিকড়ে কুঠারাঘাতে যথেষ্ট ছিল। ইসলাম পূর্ব আরবের মানবতাবিরোধী কর্মকান্ড ও বিচ্যুতি এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যে, তার ফল ছিল

অত্যাচার, অনাচার, খাদ্য ছিল মৃতের মাংস, শ্লোগান ছিল ভয়-ভীতি, আর যুক্তি ও দলিল ছিল তরবারি।

আরবের লোকদের এ ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, একমাত্র তারাই শ্রেষ্ঠ ও উন্নত যারা আরব বংশোদ্ভূত এবং আরবের রক্ত যাদের শরীরে! প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতাব্দীর গোত্র পূজা ও আমাদের সময়ের জাতীয়তাবাদ, তদানিন্তন আরবের অন্ধকার সমাজের এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রচলিত ছিল।

আরবদের নিজেদের মধ্যে অধিক ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী হওয়া তাদের মিথ্যা অহমিকা ও দাস্তিকতার কারণ ছিল। এগুলোর অধিকারী হওয়া তাদের আত্মগৌরব ও গোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব বলে পরিগণিত হতো।

অন্যায়, অত্যাচার, সন্ত্রাস, জবরদখল ও প্রতারণা ছিল ঐ সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য! আর নরহত্যা তাদের নিকট বীরত্ব বলে পরিগণিত হতো। যেহেতু কন্যা সন্তানদেরকে অবাঞ্ছিত বলে মনে করত, কিংবা জীবন নির্বাহের খরচ, দারিদ্র ও অনটনের ভয়ে ভীত ছিল, তাই নিষ্পাপ শিশু কন্যাকে তারা হত্যা করত কিংবা জীবিত সমাহিত করত। যদি কোন ব্যক্তি কোন আরবকে সংবাদ দিত যে, তার স্ত্রী কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছে তবে ক্রোধে তার চেহারা মলিন হয়ে যেত এবং লোক চক্ষুর আড়ালে থাকত। আর মনে মনে চিন্তা করত ঐ কন্যা সন্তানকে কি করবে; এ লাঞ্ছনা বরণ করে কন্যাকে রেখে দিবে, নাকি জীবন্ত সমাহিত করবে (এবং এ লজ্জার চিহ্ন থেকে নিজেকে পরিস্কার করবে। কারণ কখনো কখনো কোন পরিবারে মাত্র একটি কন্যার অস্তিত্ব থাকলে ও তা ঐ পরিবারের জন্যে লজ্জার কারণ ছিল)।<sup>১</sup>

ইমাম আলী (আ.)-এর বাণীসমৃদ্ধ অমর গ্রন্থ নাহজুল বালাগাতে তদানিন্তন আরবের সামাজিক অবস্থা এরূপে বর্ণিত হয়েছে : “. . . এবং তোমরা, হে আরব সম্প্রদায়! তখন নিকৃষ্টতম ধর্মের (মূর্তি পূজা) অনুসারী ছিলে এবং নিকৃষ্টতম ভূমিতে (নিষ্ফলা মরু প্রান্তরে) জীবন যাপন করতে, কংকরময় ভূমিসমূহে বিষাক্ত সর্পকুল যেগুলো কোন শব্দে সন্ত্রস্ত হতো না, সেগুলোর মধ্যে জীবন যাপন করতে। ঘোলা পানি পান করতে, অখাদ্য ও শক্ত খাবার গ্রহণ করতে, পরস্পরের রক্ত

বাড়াতে, আত্মীয়- স্বজনের সম্পর্ক ছিন্ন করতে, মূর্তিসমূহ তোমাদের মাঝে স্থান করে নিয়েছিলে এবং তোমরা গুনাহ থেকে দূরে থাকতে না।”

আর এরূপেই আরবের মানুষ অন্যায় ও অত্যাচারে নিমগ্ন থাকত এবং কুশিক্ষা ও অজ্ঞতার ফলে হিংস্র, লুটেরা ও কুপ্রবৃত্তি প্রবণ জনসমষ্টিতে পরিণত হয়েছিল। বিশ্বের অন্যান্য মানুষের মতই তারা কুসংস্কার ও কাল্পনিক কাহিনীসমূহকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

স্পষ্টতঃই এরকম কোন সমাজের আমূল সংস্কারের জন্যে একটি মৌলিক বিপ্লব ও সার্বিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। আর সঙ্গত কারণেই এ আন্দোলনের নেতা হবেন ঐশী ব্যক্তিত্ব। তিনি মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হবেন, যাতে সকল প্রকার অন্যায় অত্যাচার ও লোভ- লালসা থেকে দূরে থাকতে পারেন এবং সংস্কারের নামে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে নিজের বিরোধীদেরকে ধ্বংস না করেন; বরং তাদেরকে সংশোধন করার জন্যে চেষ্টা করেন এবং কেবলমাত্র আল্লাহর পথে, মানুষের কল্যাণ ও সমাজের অগ্রগতির জন্যে কর্ম সম্পাদন করেন। কারণ, নিঃসন্দেহে যে নেতৃত্ব স্বয়ং আধ্যাত্মিকতা ও চারিত্রিক গুণ বিবর্জিত হয় এবং মানবীয় উৎকর্ষতার মাঝে স্থান না পায়, তবে সে কোন সমাজকে সংস্কার করতে পারে না কিংবা কোন জাতিকে মুক্তি দিতে পারে না। কেবলমাত্র ঐশী ব্যক্তিবর্গই মহান আল্লাহর পথনির্দেশনায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনে সক্ষম।

এখন আমরা দেখব, নব বিশ্বের বিপ্লবের নেতা কিরূপ ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং এ বিশ্বে কী কী পরিবর্তন তিনি সাধন করেছেন।



## হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর জন্ম ও শৈশব

মক্ক নগরী অন্ধকার ও নীরবতার কোলে ঢলে পড়েছিল, জীবন ও কর্মের কোন চিহ্ন পরিদৃষ্ট হচ্ছিল না, সেথায় একমাত্র শশী, প্রতিদিনের মত কৃষ্ণকায় পর্বতের আড়াল থেকে উর্ধ্ব গগণে উঠে আলতো কিরণের ছোঁয়া অনাড়ম্বর ও সাদা মাটা কুটিরগুলোর উপর বুলিয়ে যাচ্ছিল; কিরণ বুলিয়ে যাচ্ছিল কংকরময় শহরের গাঁয়ে।

ধীরে ধীরে রাত্রি মধ্যরেখা পেরিয়ে গেল, হৃদয়গ্রাহী সমীরণ হেজাজের কংকরময় ভূমির উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল, কিছুক্ষণের জন্যে হলেও হেজাজ বিশ্রামাগারে পরিণত হয়েছিল। আকাশের তারাগুলো তখন এ নিমন্ত্রণ সভায় উপস্থিত হয়ে এক মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল; আর মক্কার অধিবাসীদের সাথে স্মিত হাসি হেসে যাচ্ছিল!

এখন প্রভাত! রাত জাগা ও ঘুমভাঙ্গানিয়ারা প্রাণবন্ত ধ্বনিতে স্বর্গীয় সুরে গান গেয়ে যাচ্ছে, যেন কোন প্রেয়সীর সাথে অভিসারে মগ্ন।

মক্কার দিগন্তে শুভ্র রেখা পরিদৃষ্ট হলো কিন্তু তখনও নগরের উপর এক অপ্রকাশিত নীরবতা আচ্ছাদিত হয়েছিল; সমস্ত শহর নিদ্রাভিত্ত; কেবলমাত্র আমিনাই জেগেছিল; যে বেদনার অপেক্ষায় প্রহর গুণছিল সে বেদনা অনুভব করছিল। ধীরে ধীরে বেদনা প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর হতে লাগল। হঠাৎ কয়েকজন অপরিচিত ও জ্যোতির্ময় রমনী তাঁর কক্ষে দেখতে পেলেন, তাঁদের থেকে সুগন্ধি হাওয়া ছড়িয়ে পড়ছিল। তিনি বিস্মিত ছিলেন যে তাঁরা কারা, কিরূপে এ রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রবেশ করলেন?

অনতিবিলম্বে তাঁর প্রিয় নবজাতক পৃথিবীতে পদার্পণ করল। এর এ ভাবেই আমিনা কয়েক মাস অপেক্ষার পর ১৭ই রবিউল আউয়াল প্রভাতে তাঁর সন্তানের মুখ দেখে তৃপ্ত হলেন।

সকলেই এ ঘটনায় আনন্দিত ছিলেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিশিথের তিমির বিদূরিত করে আমিনার গৃহ আলোকিত করেছিলেন তখন প্রিয় পতি যুবক হযরত আবদুল্লাহ ছিল সেথায়

অনুপস্থিত। কারণ শাম যাওয়ার পথে মদীনায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিল; আর সেই সাথে আমিনা চিরদিনের জন্যে একা হয়ে গেলেন।

## মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন এক বিস্ময়কর নবজাতক

মুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীতে আসলেন। আর সেই সাথে আকাশ এবং পৃথিবীতে অনেক ঘটনা ঘটেছিল। বিশেষ করে প্রাচ্যে, যা তখন সভ্যতার ধারক- বাহক বলে পরিচিত ছিল তাতে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল।

আর এ ঘটনাগুলোই তখন, এখনকার যুগের দ্রুতকালীন প্রচার ব্যবস্থার স্থানে ছিল যা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সংবাদ দিত। যখন এ নবজাতক ঘুণে ধরা এ সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন রীতি নীতিকে উল্টে দিয়ে উন্নয়ন ও সংস্কারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিল, তখন থেকেই ‘জাগরণ তুর্য’ ধ্বনিত হয়েছিল।

ইরানের সম্রাট আনুশিরের সুবিশাল প্রাসাদ যা চিরন্তন শক্তি ও দম্ভের প্রতীকরূপে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, আর মানুষের সকল প্রত্যাশা ছিল ঐ প্রাসাদের অধিকারীর নিকটই। কিন্তু ঐ রাতে (রাসূল (সা.)-এর জন্মের রাত্রিতে) তা প্রকম্পিত হয়েছিল ও এর চৌদ্দটি দেয়ালের উপরিভাগ ধ্বসে পড়েছিল। পারস্যে সে অগ্নি কুণ্ডলী একবারেই নিভে গিয়েছিল, যা এক সহস্র বছর ধরে প্রজ্জ্বলিত ছিল।

কল্পিত ও প্রজ্জ্বলিত খোদার প্রতি অন্ধ বিশ্বাস ও ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত ভক্তি যাদেরকে কোন প্রকার চিন্তার অবকাশ দিত না, অদ্য এ ঘটনাগুলো তাদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান করেছে।

অনুরূপ, ইরানের সাভেহ প্রদেশের নদীটি শুকিয়ে যাওয়ার ফলে, তা অপর এক বৃহদাংশের অধিবাসীদেরকে রাসূল (সা.)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে অবহিত করেছে।

## হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর দুঃসময় হালিমা

যুগ যুগ ধরে আরবের রীতি ছিল স্বীয় নবজাতককে জন্মের পর শহরের নিকটবর্তী গোত্রের কোন দুঃসময়তার নিকট অর্পণ করা। এর ফলে একদিকে মুক্ত প্রান্তরের মুক্ত আবহাওয়ায় লালিত-পালিত হবে, অপরদিকে শুদ্ধ ও প্রাজ্ঞ আরবী ভাষায় কথা বলা শিখবে, যা তদানন্তন সময়ের আরবের প্রধান আকর্ষণ ছিল।

উপরোল্লিখিত কারণ ব্যতীতও যেহেতু হযরতের মাতা আমিনার সন্তানকে পান করানোর জন্যে দুঃ ছিল না সেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর পিতামহ ও অভিভাবক আবদুল মুত্তালিব তাঁর পুত্র আবদুল্লাহর স্মৃতিচিহ্ন প্রিয় হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে কোন পবিত্র ও সম্মানিতা নারীর অনুসন্ধান করলেন। যথেষ্ট অনুসন্ধানের পর বনি সা'দ গোত্রের (বীরত্ব ও বাকপটুতার ক্ষেত্রে যাদের সুখ্যাতি ছিল) হালিমার সন্ধান পাওয়া গেল, যিনি পবিত্র ও সম্মানিত বলে পরিগণিত ছিলেন। অবশেষে তাকেই মহানবীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে নির্বাচন করা হলো।

হালিমা শিশু মুহাম্মদকে স্বীয় গোত্রে নিয়ে গেলেন এবং নিজ সন্তানের মত করে তাকে যত্ন নেয়ার চেষ্টা করতেন। বনি সা'দ গোত্র দীর্ঘ দিন যাবৎ দুর্ভিক্ষে ভুগছিল। অপরদিকে শুষ্ক প্রান্তর ও মেঘহীন আকাশ তাদের দুর্দশা ও দারিদ্রের মাত্রা বৃদ্ধির কারণ হয়েছিল।

কিন্তু যে দিন থেকে মহানবী (সা.) হালিমার গৃহে পদ ধুলি দিলেন, তার সার্বিক উন্নতি ও বরকত পরিলক্ষিত হল এবং অভাব অনটনের মধ্যে যার জীবন কাটত তার জীবনে সমৃদ্ধি দেখা দিল। আর সেই সাথে তার ও তার সন্তানদের চেহারা সতেজ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার দুহীন স্তন্য দুঃ পরিপূর্ণ হয়ে গেল; মেঘ আর উটের চারণভূমি সুবজ ঘাসে পূর্ণ হলো। অথচ ইতোপূর্বে মানুষের জীবন যাত্রা সেখানে কঠিন হয়ে পড়েছিল।

স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সা.)ও অন্য সকল শিশুর চেয়ে দৈহিকভাবে অধিক বিকাশ লাভ করেছিলেন এবং অন্যদের চেয়ে ক্ষিপ্ত গতিতে চলতে পারতেন ও অন্যদের মত ভাঙ্গা-ভাঙ্গা স্বরে কথা বলতেন না। হালিমার সুখসমৃদ্ধি ও বৈভব এমন মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, অন্যান্যরা খুব

সহজেই এ সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলো এবং তা সহজেই চোখে পড়ার মত ছিল। যেমন,  
হালিমার স্বামী হারিস বলত : তুমি কি জান, কত ভাগ্যবান সন্তান আমাদের কপালে জুটেছে?\*

## ঘটনার ঘন ঘটায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)

মহানবীর জীবনের মাত্র ছ'টি বসন্ত অতিক্রান্ত হয়েছে। মাতা আমিনা আত্মীয়- স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে এবং সম্ভবতঃ স্বামী আবদুল্লাহর সমাধি জিয়ারত করার জন্যে মক্কা থেকে মহানবী (সা.)- কে সাথে নিয়ে মদীনার পথে রওয়ানা হলেন। আত্মীয়- স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করার পর স্বামীর কবর জিয়ারত করে ফিরে আসার পথে মক্কার অদূরে আবওয়া নামক স্থানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

আর এ ভাবেই মুহাম্মদ (সা.) তাঁর শৈশবেই যখন পিতার অপরিসীম স্নেহ আর মায়ের দয়র্দ্র আঁচলের প্রয়োজন ছিল, যা প্রতিটি শিশুর জন্যেই জরুরি, তা হারালেন।

## মহানবী (সা.)- এর দৃষ্টান্ত মূলক বিশেষত্ব

যেমনটি আমরা ইতোপূর্বে জানতে পেরেছি যে, তাঁর জন্ম ও জন্ম পরবর্তীতে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল, যেগুলো তার মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রমাণবহু; তেমনি শৈশবে তার আচার-ব্যবহারও তাঁকে অন্য সকল শিশু থেকে স্বতন্ত্র করেছিল। আবদুল মুত্তালিব এ বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং হযরতকে অভূতপূর্ব সম্মান প্রদর্শন করতেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর চাচা আবু তালিব বলতেন : কখনোই মুহাম্মদ (সা.)- এর নিকট মিথ্যা শ্রবণ করিনি অথবা ও অজ্ঞতা প্রসূত কর্ম সম্পাদন করতে দেখিনি, যত্রতত্র হাঁসতেন না, অনর্থক কথা বলতেন না, অধিকাংশ সময়ই একাকী থাকতেন।

যখন মুহাম্মদের বয়স সাত বছর ছিল ইহুদীরা বলত : আমরা আমাদের কিতাবে পড়েছি যে, ইসলামের নবী হারাম দ্রব্য ও সন্দেহজনক আহার গ্রহণ থেকে দূরে থাকবেন। তবে তাঁকে পরীক্ষা করে দেখাটা ভাল। সুতরাং তারা একটি মোরগ চুরি করে হযরত আবু তালিবের জন্যে পাঠাল।

যেহেতু এ ঘটনা জানতনা সকলেই তা থেকে আহার গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) তা স্পর্শ করেও দেখেননি। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : ঐটি হারাম; মহান আল্লাহ আমাকে হারাম থেকে রক্ষা করবেন।

অতঃপর ইহুদীরা প্রতিবেশীর মোরগ এ শর্তে নিল যে, পরবর্তীতে এর মূল্য পরিশোধ করবে এবং তা পুনরায় পাঠাল। হযরত তা- ও স্পর্শ করলেন না এবং বললেন : এ খাবার সন্দেহ জনক ইত্যাদি। তখন ইহুদীরা বলল : এ বালক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে।<sup>৩</sup>

কোরাইশের নেতা আবদুল মুত্তালিব হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর সাথে অন্যান্য শিশুর মত আচরণ করতেন না, বরং তাঁকে এক বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন।

যখন আবদুল মুত্তালিবের জন্যে কা'বার সন্নিকটে একটি নির্দিষ্ট স্থানের ব্যবস্থা করা হতো এবং তাঁর সন্তানগণ ঐ স্থানের পরিপার্শ্বে স্ব স্ব স্থানে আসন গ্রহণ করতেন, তখন তাঁর মর্যাদা ও সম্মানের কারণে কারো সেখানে প্রবেশ করার অনুমতি ছিল না। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঐ মর্যাদা ও সম্মানের কারণে ঐ স্থানে প্রবেশ থেকে বঞ্চিত হতেন না এবং সরাসরি তিনি ঐ স্থানে প্রবেশ করতেন। আবদুল মুত্তালিব তাঁর সন্তানদের মধ্যে যারা তাঁকে (মহানবীকে) এ কর্ম থেকে বিরত করতে চাইত, তাদের উদ্দেশ্যে বলতেন : আমার সন্তানকে ছেড়ে দাও, আল্লাহর শপথ তিনি সুউচ্চ স্থানের অধিকারী...।

অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) কোরাইশ অধিপতি আবদুল মুত্তালিবের সাথে বসতেন, তাঁর সাথে কথোপকথন করতেন।<sup>৪</sup>

## মহানবীর শৈশব ও যৌবনের স্মৃতি কথা

### কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শৈশবকাল তাঁর অনাথ জীবনের দুঃখময় স্মৃতির মাঝে পিতামহ ‘আবদুল মুত্তালিব’ ও দয়ালু চাচা আবু তালিবের আশ্রয়ে অতিবাহিত হয়েছিল। হয়তো অনাথ জীবনের এ দুঃখ বিষাদময় দিনগুলো যা মহানবীর কোমল হৃদয়কে ব্যথাতুর করে তুলেছিল, তা তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের দৃঢ় ভিত্তির জন্যে প্রয়োজনীয় ছিল এবং প্রতিকূল ঘটনার মোকাবিলায় তাঁর ধৈর্য ও স্বৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে শিক্ষারূপে ছিল। আর এ প্রক্রিয়ায় পরবর্তীতে রেসালতের গুরুদায়িত্ব অর্পণ জন্যে তাঁকে প্রস্তুত করেছিল।

মহানবী (সা.) একটু একটু করে বড় হতে লাগলেন এবং যৌবনে পদার্পণ করলেন যা মানুষের জন্যে কামনা বাসনা ও শক্তি মত্তার প্রস্ফুটন কাল। যদিও তিনি মায়ের আদর আর পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিলেন কিন্তু হযরত আবু তালিব নৈতিক দায়িত্ববোধের কারণে ও আবদুল মুত্তালিবের আদেশক্রমে তাঁকে রক্ষণাবেক্ষণ ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে সকল কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জন্যে তিনটি বিষয় ছিল : পুত্র, ভাই আবদুল্লাহ ও পিতা আবদুল মুত্তালিবের স্মৃতি চিহ্ন। আর এ জন্যে তিনি (মহানবী) তার পারিবারিক সদস্য বলে পরিগণিত হতেন। তার অন্যান্য সন্তানের মতই মহানবী (সা.) একই দস্তুরখানায় বসতেন এবং তারই গৃহে মাথা গুজেছিলেন। আবু তালিব (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্যে ছিলেন এক দয়ালু পিতা এক বিশ্বস্ত চাচা ও এক আন্তরিক অভিাবক। আর এ চাচা ভাইপো পরস্পর পরস্পরের প্রতি এতটা নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন যেন তাদের জীবন ও আত্মার রজ্জু একই সূত্রে গ্রথিত ছিল। তাদের এ নিবিড় সম্পর্কের কারণেই হযরত আবু তালিব কখনোই তাঁকে নিজ থেকে দূরে রাখতেন না এবং তাঁকে সাথে নিয়েই আরবদের সাধারণ বাজারসমূহ যেমন, উকাজ, মুজনাহ ও যিল মাজায়ে আসা যাওয়া করতেন। এমন কি মক্কার কাফেলার সাথে যখন শামে (সিরিয়ায়) ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে যেতে চাইলেন, তখনও তাঁর



বিরহ সহ্য করতে পারছিলেন না। ফলে তাঁকে সাথে নিয়েই শামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।  
মহানবী (সা.) উটের পিঠে আরোহন করে ইয়াসরেব ও শামের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করলেন।<sup>৫</sup>

## বোহাইরার সাথে হযরত মুহাম্মদের সাক্ষাৎ

যখন কোরাইশদের কাফেলা বসরার<sup>৬</sup> দিকে আসছিল তখন বোহাইরা নামক এক সন্ন্যাসী তার আশ্রম থেকে হঠাৎ দেখতে পেল যে, একটি কাফেলা আসছে যাদের মাথার উপর একখণ্ড মেঘ তাদের উপর ছায়া দিয়ে সাথে আসছে।

বোহাইরা আশ্রম থেকে বের হয়ে আসল এবং এক কোণে দাঁড়িয়ে তার সহযোগীকে বলল : তাদেরকে গিয়ে বল যে, আজ তোমরা আমাদের অতিথি। মুহাম্মদ (সা.) ব্যতীত কাফেলার সকলেই তার নিকট আসল। মুহাম্মদ (সা.) আসবাব পত্রের নিকট দাঁড়িয়েছিলেন। বোহাইরা যখন দেখল যে মেঘখণ্ড যথাস্থানে দাঁড়িয়ে আছে এবং স্থানান্তরিত হচ্ছে না, তখন বলল : তাঁকেও নিয়ে আস। যখন মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে আসা হচ্ছিল, মেঘ খণ্ডও তাঁর সাথে আসছিল। ঐ সন্ন্যাসী তাঁকে আড় চোখে ভাল করে দেখছিল। পানাহারান্তে তাঁকে বলল : আমি কিছু প্রশ্ন করব? তোমাকে লাভ, ওজ্জার<sup>৭</sup> কসম দিয়ে বলছি, আমার প্রশ্নের জবাব দাও!

মুহাম্মদ (সা.) বললেন : আমার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্টতম নাম হলো এ দুটি নাম যাদের কসম তুমি আমাকে দিয়েছ।

বোহাইরা বলল : তোমাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

মুহাম্মদ (সা.) বললেন : তোমার প্রশ্ন বল! বোহাইরা মহানবীর (সা.) সাথে একটি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার সম্পন্ন করল। অতঃপর তাঁর হাতে পায়ে চুম্বন দিতে লাগল এবং বলল : যদি তোমার সময়কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে তোমার সাথে থেকে তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। তুমি তো বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠ সন্তান...।

অতঃপর সে জিজ্ঞাসা করল যে, ‘এ কিশোর কার সন্তান?’

কাফেলার লোকজন হযরত আবু তালিবের দিকে ইঙ্গিত করে বলল যে, তাঁর সন্তান। বোহাইরা : না, এ কিশোরের পিতা কখনোই বেঁচে থাকতে পারে না।

হযরত আবু তালিব : হ্যাঁ, সে আমার ভাইপো। বোহাইরা : এ কিশোরের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও গুরুত্বপূর্ণ। আমি যা তার মধ্যে দেখতে পাই, তা যদি ইহুদীরা জানতে পারে, তবে তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলবে; লক্ষ্য রেখ যেন ইহুদীরা তার কোন ক্ষতি না করতে পারে। আবু তালিব : তবে সে কী করবে, আর ইহুদীদেরই বা তার সাথে কী কাজ?

বোহাইরা : সে ভবিষ্যতে নবী হবে এবং তার নিকট ওহীর ফেরেশতা অবতীর্ণ হবে।

আবু তালিব : মহান আল্লাহ তাঁকে নিরাশ্রয় করবেন না (এবং শত্রু ও ইহুদীদের থেকে রক্ষা করবেন)।<sup>৮</sup>

## রাখালী ও মহানবী (সা.)- এর চিন্তা- চেতনা

যদিও হযরত আবু তালিব ছিলেন কোরাইশদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, কিন্তু বিশাল পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করার মত যথেষ্ট সম্পদ তার ছিল না। স্বভাবতঃই বয়োপ্রাপ্ত যুবক হযরত মুহাম্মদ (সা.) কোন কর্মে আত্মনিয়োগ করতে এবং আপন চাচার বিরূপ ব্যয়ভার লাঘব করতে চাইলেন। কিন্তু কী ধরনের পেশা তিনি নির্বাচন করবেন, যা তার মন মানসিকতার সাথে অধিক সাযুজ্যপূর্ণ হবে? যেহেতু মহানবী (সা.) পরবর্তীতে নবী ও শ্রেষ্ঠ নেতা হবেন এবং বলগাহারা ও গাঁড়া এক সম্প্রদায়ের সম্মুখীন হবেন। আর অন্ধকার যুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস ও ভ্রান্ত প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হবেন এবং ন্যায়পরায়ণতার সুউচ্চ মিনার ও জীবনের সঠিক নীতির ভিত্তি স্থাপন করবেন সেহেতু রাখালের পেশা গ্রহণ করাটাই অধিক যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন।

মুহাম্মদ (সা.) তাঁর আত্মীয় স্বজন ও মক্কাবাসীদের পশু ও মেঘ মক্কার আশেপাশের চারণ ভূমিতে নিয়ে যেতেন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন এবং এ ভাবে যা উপার্জন করতেন, তা দিয়ে হযরত আবু তালিবকে সাহায্য করতেন।<sup>১৫</sup> আর সেই সাথে শহরের কোলাহল ও যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে দূরে মরু প্রান্তরের মুক্ত পরিবেশের অবসরে নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, যেগুলো পরবর্তীতে তাঁর রেসালতের প্রচারকালে সুফল প্রদান করেছিল।

যাহোক, তিনি ইতোমধ্যে দয়া, সৎকর্ম, বদান্যতা, উদারতা, প্রতিবেশী সুলভ আচরণ, সততা, বিশ্বস্ততা এবং কুপ্রবৃত্তি পরিহার ইত্যাদি সকল গুণে মানুষের শীর্ষে অবস্থান করেছিলেন। আর এ কারণেই তিনি ‘মুহাম্মদ আমীন’ নামে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।<sup>১৬</sup>

## মহানবী (সা.)- এর সততা

যখন বয়োপ্রাপ্তির ফলে মানুষের কামনা, বাসনা ও সুগু শক্তির প্রকাশ ঘটে, শিশু কিশোররা তাদের শৈশব ও কৈশর অতিক্রম করে উদ্দাম ও উদ্দীপনাময় যৌবনে পদার্পণ করে এবং নিজেকে অন্য এক জগতে খুঁজে পায়, তখন যৌবনের এ স্পর্শকাতর মুহূর্তে নানা ধরনের বিচ্যুতি, কলুষতা, অন্যায়, অনাচার, অশ্লীলতা উচ্ছৃঙ্খলতা যুবকদেরকে গ্রাস করতে আসে। আর তখন যদি যুবকদের প্রতি সঠিক লক্ষ্য না রাখা হয় কিংবা স্বয়ং যুবকরা যদি তা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা না করে তবে দুর্ভাগ্যের পর্বত পদতলে পতিত হবে যেখান থেকে পুনরায় সৌভাগ্যের রঙিন পাখিকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

মহানবী (সা.) এমন এক কলুষিত সমাজে জীবন-যাপন করতেন, যার পরিবেশ অসংখ্য চারিত্রিক অনাচার ও পাপাচারে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল; যুবকরা এমনকি আরবের বৃদ্ধরাও অশ্লীল ও নির্লজ্জভাবে অসততা ও যৌন অনাচারে নিমগ্ন ছিল। আর এ জন্যে অশ্লীলতার নিদর্শনস্বরূপ অলিতে গলিতে কোন কোন গৃহের উপর কালো পতাকা উত্তোলিত ছিল এবং এ প্রক্রিয়ায় উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিদেরকে অন্যায়ের পথে নিমন্ত্রণ জানাত।

মহানবী (সা.) এমন এক কলুষিত সমাজেই শৈশব থেকে যৌবনে পদার্পণ বরলেন এবং পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হলেও পরিবেশের প্রভাব তাঁর উপর পতিত হয়নি। কিঞ্চিৎ পরিমাণ অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মই তাঁকে করতে দেখা যায়নি। বরং শত্রু মিত্র সকলেই তাঁকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে আখ্যায়িত করেছিল।

কোরাইশ তনয়ার (হযরত খাদিজা) সাথে মহানবীর দাম্পত্য জীবনের বর্ণনা যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তাতে তাঁর শ্রেষ্ঠ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা ফুঁটে উঠেছে। যেমন তাঁর লাজুক প্রকৃতির কথা হযরত খাদিজাকে উদ্দেশ্য করে লেখা কবিতার ভাষায় এ ভাবে বর্ণিত হয়েছে :

হে খাদিজা! তুমি পৃথিবীর মানুষের মাঝে সর্বোত্তম স্থানে পৌঁছেছো,

আর সকলের চেয়ে সমুন্নত হয়েছো,

অর্থাৎ তুমি সে মুহাম্মদ (সা.)- এর নৈকট্য লাভ করেছো,  
পৃথিবীর কোন নারী তাঁর মত সন্তান ভূমিষ্ঠ করেনি; উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মহত্ব ও  
আত্মসম্মানের মত সকল গুণ তাঁরই মাঝে সমাহার ঘটেছে। আর চিরদিন এরূপই থাকবে।<sup>১১</sup>  
অন্য এক কবি তার কবিতায় বলেন : যদি আহমদ (সা.)- এর সাথে সমস্ত সৃষ্টিকেও তুলনা করা  
হয়, তবে তিনিই হবেন সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রকৃতই তাঁর মর্যাদা কোরাইশদের জন্যে স্পষ্ট ও তর্কাতীত  
ছিল।<sup>১২</sup>

## হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর প্রথম বিবাহ

যৌবন কাল বিভিন্ন কামনা বাসনা জাগ্রত ও জৈবিক চাহিদার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় সময়। যখন ছেলে মেয়েরা বয়সের এ বিন্দুতে পৌঁছে, তখন স্বীয় অভ্যন্তরে পরস্পরের প্রতি এক আকর্ষণ উপলব্ধি করে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মানসিক প্রশান্তি ও স্থিতি লাভ করতে পারে না এবং তাদের অন্তরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নির্বাপিত হয় না।

অতএব, ইসলামে সঠিকভাবে এ পারস্পরিক অনুরাগ থেকে লাভবান হওয়ার জন্যে এবং যৌন আনাচার প্রতিরোধ করার জন্যে অতি গুরুত্বের সাথে যুবক- যুবতীকে দ্রুত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং ভবিষ্যতে জীবন নির্বাহের খরচের যোগান দিতে পারবে না এ আশঙ্কার অজুহাতে কেউ যেন বিবাহ থেকে দূরে না থাকে।<sup>১৩</sup>

কিন্তু কখনো কখনো জীবনব্যবস্থা এতটা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয় যে, বিবাহের প্রাথমিক শর্তসমূহ পূরণ ও জীবন নির্বাহের খরচ সংগ্রহ করতে অপারগ বলে মনে হয়। নিঃসন্দেহে এমতাবস্থায় উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে দূরে থাকতে হবে। আর সেই সাথে নিজেকে পূত পবিত্র রাখতে হবে।<sup>১৪</sup>

মহানবী (সা.)ও ২৫ বছর কাল<sup>১৫</sup> পর্যন্ত এমনই এক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহ করার সামর্থ্য তাঁর ছিল না।

অতএব, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে দূরে থাকাটাই শ্রেয় মনে করলেন এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্যে ও অনুকূল পরিস্থিতির অপেক্ষায় থাকলেন।<sup>১৬</sup>

## হযরত খাদিজার পরামর্শ

হযরত খাদিজা ছিলেন এক ধনাঢ্য ও সম্মানিতা রমণী। তিনি তার অর্থ সম্পদ ব্যবসার জন্যে অপরের নিকট অর্পণ করতেন এবং এ কাজের বিনিময়ে তাকে পারিশ্রমিক দিতেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর সত্যবাদিতা, একনিষ্ঠতা, মর্যাদা ও খ্যাতির কথা সমস্ত আরবে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর এভাবে তা হযরত খাদিজার কর্ণগোচর হলে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর সাথে ব্যবসা করার চিন্তা করলেন। তিনি এ বিষয়টি মহানবীর নিকট উপস্থাপন করলেন এবং প্রস্তাব দিলেন : কিছু সম্পদ এক গোলামসহ (যার নাম মাইসারাহ বলা হয়) আপনার নিকট অর্পণ করা হবে এবং অন্যদেরকে যা পরিশোধ করা হতো তার চেয়ে অধিক আপনাকে পরিশোধ করব। হযরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত আবু তালিবের অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি জানতেন যে, বার্ধক্যের কারণে বিশাল পরিবারের ভার বহন করার মত সন্তোষজনক অর্থনৈতিক অবস্থা তাঁর চাচার ছিলনা। ফলে তিনি হযরত খাদিজার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।<sup>১৭</sup>



## খাদিজা কে?

খাদিজা ছিলেন খুয়াইলিদের কন্যা, অনন্য ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এক রমনী। তিনি রাসূলের পূর্বে দু'বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী দু'স্বামী ছিলেন মৃত আবু হালা' ও 'আতিক মাখযুমী'।

খাদিজা তাঁর জীবনের চল্লিশ বছর অতিক্রম করলে ও তাঁর অচেল সম্পত্তি ও জনপ্রিয়তার কারণে কোরাইশ পতিদের মধ্যে ও তদানিন্তন সময়ের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকেই তাঁর পাণি প্রার্থনা করত।

কিন্তু হযরত খাদিজা তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং বিবাহ করেন নি। কারণ তিনি জানতেন যে, হয় তারা জীবন সঙ্গী হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা অথবা তাঁর সম্পদের লোভে তার পাণি প্রার্থনা করছে।<sup>১৮</sup>

## শামের পথে যাত্রা

যখন কোরাইশের বাণিজ্য কাফেলা শামের পথে যাত্রা করার জন্যে প্রস্তুতি নিল এবং মহানবী (সা.)ও তাঁর সফরের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন, তখন হযরত খাদিজা তাঁর গোলাম মাইসারাকে নির্দেশ দিলেন : তুমিও মুহাম্মদ (সা.)- এর সাথে তাঁর খেদমতের জন্যে শামে যাও! যদিও এ ঐতিহাসিক সফরের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া এ পুস্তিকার ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয় তথাপি এতটুকু বলা যায় যে, এ সফর ছিল অতি বরকতময় ও কল্যাণময়। এগুলোর মধ্যে ব্যবসায় প্রচুর লাভবান হওয়া, কাফেলার জন্যে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর অনন্য ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটা, খ্রিস্টান পাদ্রীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ও তাঁর নবুওয়াত লাভ সম্পর্কে তার (খ্রিস্টান পাদ্রীর) ভবিষ্যদ্বাণী<sup>১৯</sup> এবং এক বরকতময় দাম্পত্যজীবনের পূর্ব প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়া ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

এ সফর কিছু দিন পর সম্পন্ন হলে কাফেলা শাম থেকে ফিরে আসল। মাইসারাহ এ সফরের বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিক, তাদের অভূতপূর্ব লাভের কথা এবং এ সফরে প্রকাশিত মহানবীর মহত্ব ও বিভিন্ন কারামতের কথা কোরাইশের নন্দিতা রমণী হযরত খাদিজার কর্ণগোচর করল।<sup>২০</sup>

হযরত খাদিজা এক ইহুদী আলেমের কাছ থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর ঐশী ব্যক্তিত্বের ও কোরাইশের অন্যতম রমণীর (খাদিজা) সাথে তাঁর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কথা শুনেছিল। আর এখন তার গোলামের নিকট এ সমুদয় সংবাদ শুনে শুধু যে হযরতের প্রতি প্রেমাসক্তি তাঁর হৃদয়ে লালন করতে লাগলেন, তা নয়; বরং তাঁকে তাঁর আদর্শ স্বামী হিসাবে মনে করতে লাগলেন।<sup>২১</sup>

অনুরূপ তাঁর চাচা ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের নিকট তিনি পূর্ববর্তী নবীগণের (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর আবির্ভাবের সুসংবাদ ও খাদিজা নামক রমণীর সাথে তাঁর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কথা শুনে ছিলেন।<sup>২২</sup> ফলে তাঁর আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

কিন্তু কিরূপে তাঁকে এ কথা জানানো যেতে পারে? এ কর্মটি স্বয়ং তাঁর জন্যে যিনি কোরাইশের অনন্য ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন রমণী ছিলেন, সহজ ছিল না।

## বিবাহের প্রস্তাব

হযরত খাদিজা তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী নাফিসার নিকট চেয়েছিলেন, সে যেন এ ব্যাপারে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর সাথে আলোচনা করে। নাফিসা হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর নিকট গেলেন এবং বললেন : কেন বিয়ে করছেন না? তিনি জবাবে বললেন : আমার আর্থিক অবস্থা ও ব্যক্তিগত অবস্থা আমাকে অনুমতি দেয় না। নাফিসা বললেন : যদি এ সমস্যা দূরীভূত হয় এবং সুন্দরী, ধনবতী, সম্মানিতা ও খ্যাতিমান পরিবারের কোন কন্যা আপনার জন্যে পাওয়া যায়, তবে আপনি কি তা গ্রহণ করবেন?

হযরত মুহাম্মদ (সা.) বললেন : এ রমণী কে, যার কথা তুমি বলছ?

নাফিসা বলল : খাদিজা।

হযরত বললেন : এটা কিরূপে সম্ভব যে সে কোরাইশের ধনিক ও বণিক শ্রেণীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, অথচ আমার সঙ্গে বিবাহে রাজি হবে?!

নাফিসা বলল : হ্যাঁ, এটা সম্ভব এবং আমি তা সম্পন্ন করব।<sup>২৩</sup>

যখন মহানবী (সা.) পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারলেন যে, খাদিজা তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে ইচ্ছুক, তখন তিনি একথা তাঁর চাচাদের কাছে জানালেন।

তারা এ শুভসংবাদ শুনে খুবই আনন্দিত হলেন এবং অনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। অবশেষে বিশেষ বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহ কার্য সম্পন্ন করেন।<sup>২৪</sup>

খাদিজা ছিলেন প্রথম নারী, যিনি মহানবী (সা.)- এর উপর ঈমান এনেছিলেন এবং তাঁর সকল সম্পদ ইসলামের প্রচারের জন্যে রাসূল (সা.)- এর হাতে অর্পণ করেন।<sup>২৫</sup> মুহাম্মদ (সা.)- এর এ দাম্পত্য জীবনেই ছয়টি সন্তান লাভ করেছিলেন : কাসিম ও তাহির নামে দু'পুত্র যারা শৈশবেই মৃত্যু বরণ করেন এবং রুকায়্যা, যয়নাব, উম্মে কুলসুম ও ফাতেমা (আ.) নামক চার কন্যা। তাদের মধ্যে হযরত ফাতেমা (সা.) ছিলেন অন্যতম।<sup>২৬</sup> খাদিজা হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর দীনের জন্যে যে ধৈর্য ও ত্যাগ- তিতীক্ষা প্রদর্শন করেছিলেন, তা তাঁর জীবদ্দশায়ই কেবলমাত্র

হযরতের জন্যে হৃদয় গ্রাহী ছিল না, বরং তাঁর (খাদিজার) মৃত্যুর পরও যখন তাঁর কথা স্মরণ করতেন, হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তেন।<sup>২৭</sup> কখনো কখনো তাঁর বিয়োগ বেদনায় অশ্রু বিসর্জন দিতেন...।

যাহোক, খাদিজার জীবনের সূর্য ৬৫ বছর বয়সে অর্থাৎ নবুওয়াতের দশম বছরে অস্তমিত হয়েছিল। আর সেই সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর গৃহে চিরদিনের জন্যে খাদিজার দ্যুতি নিভে গেল।

মহানবী (সা.)- এর একাধিক বিয়ের দর্শন ও খ্রিস্টানগণ কর্তৃক অপবাদ দানের কয়েকটি উদাহরণ :

## খ্রিস্টানগণ কর্তৃক অপবাদ প্রদানের কয়েকটি দৃষ্টান্ত

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে খ্রিস্টবাদী লেখকরা ইসলামের বিরুদ্ধে নতুন সংগ্রাম শুরু করেছিল। তারা মিথ্যা ও হঠকারিতায় পূর্ণ পুস্তকসমূহ প্রকাশ করে ইসলাম ধর্মের প্রতি মানুষের আকর্ষণ নষ্ট করতে এবং ইসলামের মহান প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর প্রতি মানুষের অন্তরে বিবেচনাগার করতে চেয়েছিল।<sup>২৮</sup>

এ কল্পকাহিনীসমূহ এবং খ্রিস্টানদের বিভিন্ন গোঁড়ামীপূর্ণ গল্প কাহিনীর প্রথম সূতিকাগার ছিল মধ্যযুগ, বিশেষ করে পঞ্চদশ শতাব্দীতে। জন অ্যান্ডার মুর (Mure .A.J) নামক এক ব্যক্তি ‘মুহাম্মদের দীনের অসারতা’ নামক একটি পুস্তক লিখেছিল যা পরবর্তী ইসলাম বিদ্বেষী লেখকদের খোরাক যুগিয়েছিল। আর যেহেতু অন্যান্য লেখক আরবী ভাষা জানত না এবং ইসলামের উৎসসমূহ তাদের নাগালে ছিল না সেহেতু ইসলাম পরিচিতির ক্ষেত্রে তারা মূরের পুস্তক নকল বা তার সিদ্ধান্তেই তুষ্ট থেকেছিল।<sup>২৯</sup>

হ্যাঁ, যাদের তথাকথিত ‘পবিত্র গ্রন্থে’ প্রকাশ্যে নবী (আ.) গণের উপর যৌন অনাচারের অপবাদ দেয়<sup>৩০</sup> তারাই আবার আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর সম্পর্কে লিখে যে, তিনি কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করেছিলেন। অর্থাৎ যেখানে তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে কেবলমাত্র চারজন স্ত্রী রাখার অধিকার দিয়েছেন অথচ স্বয়ং তিনি একাধিক (চারের অধিক) স্ত্রীর অধিকারী ছিলেন?!<sup>৩১</sup>

তারা তাদের জ্বল চিন্তায় অজ্ঞ খ্রিস্টবাদী গায়কের ভাষায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে কুপ্রবৃত্তির অনুসারী বলে পরিচয় করাতে চেয়েছিল, যাতে এর মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্বহানি করতে পারে এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসার রোধ করতে পারে।

কিন্তু তাদের এহেন অপচেষ্টা অপরাপর প্রচেষ্টার মতই অসার ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। কারণ ন্যায়পরায়ণ খ্রিস্টীয় পণ্ডিতগণ মহানবী (সা.)- এর স্বপক্ষে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এবং

কোরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর উপর যে মানহানিকর আক্রমণ চালানো হয়েছিল তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।

নিঃসন্দেহে এ ধরনের বানোয়াট বক্তব্য আমরা যারা নবিগণের (আ.) পবিত্রতায় বিশ্বাস করি, তাদের নিকট অবাঞ্ছিত বৈ কিছু নয়। কিন্তু যারা আমাদের এ বিশ্বাসের সাথে একমত নয় তাদের জন্যে প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হওয়া প্রয়োজন।

## ইতিহাসের বিচার

সত্যনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ইতিহাসবেত্তাগণ, কি মুসলমান কি খ্রিস্টান তাদের গ্রন্থসমূহে লিখেছেন : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিবাহসমূহ কোন কামনার ফল ছিল না। কারণ, যদি তাই হতো, তবে ২৫ বছর বয়সে যখন যৌবনের উত্তাল ও উদ্দম যুবকদেরকে ষোড়শী যুবতী স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা আবিষ্ট করতে পারেনা, তখন তিনি ৪০ বছর বয়সের প্রৌঢ়া নারী হযরত খাদিজার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতেন না, যিনি ইতোপূর্বে ও দু'জন স্বামীর সংসার করেছিলেন।

মুহাম্মদ (সা.) হযরত খাদিজার সাথে ২৫ বছর<sup>০২</sup> বয়স পর্যন্ত আন্তরিকতা ও আনন্দের সাথে জীবন যাপন করেছিলেন এবং যদিও আরবের কুমারী, যুবতীরা তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে আগ্রাহান্বিত ছিল, কিন্তু তিনি একবারের জন্যেও অন্য কোন কুমারী রমণী বিবাহ করেন নি।

নিঃসন্দেহে যদি মহানবী (সা.) কোন কামাতুর ব্যক্তি হতেন, তবে অবশ্যই এ সুদীর্ঘ সময় ধরে কুমারী ও যুবতী নারীর পাণি গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারতেন না।



## ছিদ্রাশ্বেষীদের নিকট প্রশ্ন

যদি কেউ বর্ণিত ব্যক্তিদের নিকট জিজ্ঞাসা করে : কি কারণে মহানবী (সা.) যৌবনের শুরুতে এক প্রৌঢ়া স্ত্রীর সাথে সংসার করেছিলেন এবং অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণ করেন নি, অথচ জীবনের শেষ দশ বছরে যখন তার বার্ধক্য ঘনিয়ে এসেছিল, এছাড়া অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভারসাম্য রক্ষাকরণ ইত্যাদি তাঁর বিবাহের জন্যে অনুকূল ছিল না, তখন তিনি একাধিক বিবাহ করেন?

অনাথ ও সর্বস্বহারা নারীদেরকে ভরণ পোষণ দেয়া কি স্বয়ং এক কঠিন কাজ নয়? বিচিত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মনমানসিকতার অধিকারী স্ত্রীদের সাথে জীবন যাপন করা কি আরাম-আয়েশের সাথে সায়ুজ্যপূর্ণ? ৫০ বছরের একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের জন্যে একজন যবুতী স্ত্রী, যে ব্যক্তির মর্যাদা ও স্থান সম্পর্কে অজ্ঞ তার সাথে জীবন যাপন করা কি কোন সহজ ব্যাপার?<sup>৩৩</sup>

নিঃসন্দেহে ছিদ্রাশ্বেষীদের নিকট এর কোন জবাব নেই। সঙ্গত কারণেই তাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) কখনোই কামাতুর ছিলেন না এবং তারা হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে মহানবীর উপর এ ধরনের অপবাদ প্রদান করেছিল। আর এটা কতই না অন্যায় ও হীন কর্ম!

জন ডেভেন পোর্ট বলেন : এটা কি করে সম্ভব, যে ব্যক্তি এতটা কামাতুর সে এমন এক দেশে যেখানে একাধিক স্ত্রী থাকাটা এক সাধারণ নিয়ম বলে পরিগণিত হতো, সেখানে থেকে ২৫ বছর ধরে মাত্র একজন স্ত্রী নিয়েই তুষ্ট ছিলেন?<sup>৩৪</sup>

## রাসূল (সা.)- এর স্ত্রীর সংখ্যা

ইসলামের নবী (সা.) খাদিজার পর একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে সাওদা, আয়েশা, গাজিয়া, হাফসাহ, উম্মে হাবিবা, উম্মে সালামাহ, যয়নাব বিনতে যাহেশ, যয়নাব বিনতে খুযাইমাহ, মাইমুনাহ, জুযাইরিয়াহ, সাফিয়াহ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এখন যে পরিস্থিতিতে মহানবী (সা.)- কে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে হয়েছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করছি।

মূলতঃ কয়েকটি উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) একাধিক বিয়ে করেছিলেন:

১. অনাথ ও অসহায়ের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের আত্মসম্মান রক্ষা করার জন্যে, যারা ইতোপূর্বে সম্মান ও প্রতিপত্তির সাথে জীবন যাপন করতেন, কিন্তু স্বীয় অভিভাবককে হারানোর ফলে তাদের সম্মান প্রতিপত্তি এখন বিপর্যস্ত, মহানবী (সা.) তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। নতুবা তাদের গোত্র তাদেরকে ফিরিয়ে নিত এবং তাদেরকে কুফর করতে ও ইসলামের অস্বীকৃতিতে বাধ্য করত। যেমন : সাওদা, যার স্বামী হাবাশায় (ইথিওপিয়া) হিজরত করার পর পরলোক গমন করেছিলেন। ফলে তিনি অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছিলেন।

রাসূল (সা.) খাদিজাকে হারানোর পর বিপত্নীক ছিলেন এবং সাওদার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন।

যয়নাব বিনতে খুযাইমা ছিলেন রাসূলের অপর এক স্ত্রী। তিনি এক বিধবা রমণী ছিলেন যিনি স্বামীর মৃত্যুর পর একদিকে অভিভাবকহীন এবং অপরদিকে দারিদ্রকবলিত হয়ে পড়েছিলেন। অথচ তিনি ছিলেন দানশীলা, উদার এবং উম্মুল মাসাকীন (নিঃস্বদের মাতা) আল্লাহর রাসূল (সা.) যয়নাবের সম্মান রক্ষার্থে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। যয়নাব বিনতে খুযাইমা রাসূলের জীবদ্দশায়ই পরলোক গমন করেন।

উম্মে সালামাও ছিলেন বয়স্কা ও অনাথ সন্তানের মাতা, ঈমানদার। তিনিও নবী (সা.)- এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

২.প্রচলিত অবস্থার পরিবর্তন ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের ভ্রান্ত রীতি- নীতির প্রাচীর চূর্ণ করে দেয়ার জন্যে তাঁর ফুফাত বোন ‘যয়নাব বিনতে জাহাশের’ সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, যিনি রাসূলের পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারিসের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। যায়েদের সাথে যয়নাবের যে বিবাহ মহানবী (সা.)- এর নির্দেশানুসারে সম্পন্ন হয়েছিল তা স্বয়ং ইসলামের শ্রেণী বৈষম্যহীন বিশেষত্বেরই দৃষ্টান্ত। কারণ, যয়নাব ছিলেন কোরাইশ অধিপতি আবদুল মুত্তালিবের দৌহিত্রদের মধ্যে একজন, আর যায়িদ ছিল পারিবারিক দিক থেকে কৃতদাস, যিনি রাসূল (সা.)- এর নির্দেশে মুক্তি পেয়েছিলেন।

যয়নাব যেহেতু অভিজাত পরিবারের ছিলেন, সেহেতু যায়েদের সাথে দাস্তিকতাপূর্ণ আচরণ করত; আর এভাবে নিজের দাম্পত্য জীবনে তিক্ততা সৃষ্টি করত এবং রাসূল (সা.) তাদেরকে শতভাবে উপদেশ দিলেও তাতে কোন ফল হয়নি। অবশেষে যায়েদ যয়নাবের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছিল এবং তাকে তালাক দিয়েছিল।

যয়নাব তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার পর মহানবী (সা.) মহান আল্লাহর আদেশে তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন, যাতে মানুষের মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কার ও অযৌক্তিক রীতি- নীতির মূলোৎপাটিত হয়। (যেহেতু তারা পালক পুত্রকে স্বীয় প্রকৃত পুত্র বলে মনে করত এবং তার স্ত্রীকে নিজের জন্যে নিষিদ্ধ মনে করত)।<sup>৩৫</sup>

খ্রিস্টবাদী কিছু লেখক এ বিষয়টির ক্ষেত্রে (হযরতের একাধিক বিবাহ) এতটা বিচ্যুত ও কুরটনাকারী হয়েছিল যে লিখেছিল : আল্লাহর রাসূল যয়নাবের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন! এ বক্তব্যটি এতটা অনর্থক ও অযৌক্তিক যে তা সমস্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির পরিপন্থী। কারণ যদি নবী (সা.) কুমন্ত্রনা ও এ ধরনের ধ্যান- ধারণার বশবর্তী হতেন কিংবা যয়নাবের রূপ সৌন্দর্য এতটা মনোহরী ছিল যে, হযরতকে প্রেমাসক্ত করে ফেলেছিল যদি তাই হতো, তবে কেন যখন যয়নাব কুমারী ও বিশেষ আকর্ষণের অধিকারী ছিল আর রাসূলও (সা.) উদ্দাম যৌবনের অধিকারী ছিলেন, তখন কেন তার প্রতি আসক্ত হলেন না; বিশেষ করে এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে যয়নাব তো তখনও তার নিকট অপরিচিত ছিল না? বরং

রাসূলের নিকটাত্মীয়দের মধ্যেই তিনি পরিগণিত হতেন এবং পারিবারিক পরিচিতের মাধ্যমে তারা পরস্পরের সুন্দর বা কুৎসিত হওয়া সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

৩. বন্দী ও দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়ার জন্যে; যেমন, ‘জুয়াইরিয়াকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। জুয়াইরিয়া ছিলেন সম্ভ্রান্ত বনি মুসতালিক গোত্রের কন্যা, যিনি ইসলামী বাহিনীর সাথে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী হয়েছিলেন। মহানবী (সা.) হারেসের কন্যা জুয়াইরিয়ার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। হারেস ছিলেন গোত্রপতি। মুসলমানরা যখন দেখল যে, বন্দীরা হযরতের আত্মীয়দের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তখন তাদের (বন্দীদের) অনেককেই মুক্তি দিয়েছিলেন। ইবনে হিশামের মতে এ বিবাহের সুবাদে বনি মুসতালিকের একশতটি পরিবার মুক্তি পেয়েছিল।<sup>৩৬</sup>

৪. আরবের বৃহত্তর গোত্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও তাদের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংরক্ষণ করার জন্যে নবী (সা.) আয়েশা, হাফসা, উম্মে হাবিবা, সাফিয়া ও মাইমূনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

উম্মে হাবিবা ছিলেন সেই আবু সুফিয়ানের কন্যা যার বংশ (ইসলামের) রেসালতের ধারক সম্মানিত (হাশেমী) পরিবারের সাথে আপোসহীন শত্রুতা প্রদর্শন করত। তার স্বামী হাবাশে ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিস্টান হয়েছিল এবং অতঃপর পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছিল। উম্মে হাবিবা কঠিন সঙ্কটময় অবস্থায় দিনাতিপাত করছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন মুসলমান; অপর দিকে তার পিতা ছিল নবী (সা.)- এর ঘোর শত্রু। ফলে তিনি তার পিতা (আবু সুফিয়ানের) নিকট আশ্রয় নিতে পারছিলেন না। সুতরাং উম্মে হাবিবা অভিভাবকহীন ও বঞ্চিত নারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন।

মহানবী (সা.) বনি উমাইয়াদের অন্তর জয় করার জন্যে এবং সেই সাথে উম্মে হাবিবার অভিভাবকত্ব গ্রহণের জন্যে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন।<sup>৩৭</sup>

সাফিয়া ছিলেন হাই ইবনে আখতাবের কন্যা, যিনি বনি নাযির গোত্রের প্রধান ছিলেন। ইহুদী বন্দীরা মুসলমানদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ার পর হযরত (সা.) সাফিয়ার ব্যক্তিত্ব রক্ষা

করার জন্যে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। আর এ প্রক্রিয়ায় বনি ইসরাইলের একটি শ্রেষ্ঠ গোত্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।<sup>৩৮</sup>

বৃহত্তর গোত্র বনি মাখযুমের রমণী ছিলেন মায়মূনা, যাকে মহানবী (সা.) সপ্তম হিজরীতে বিবাহ সম্পন্ন করেন।<sup>৩৯</sup>

নবী (সা.)- এর স্ত্রীগণের মধ্যে আয়েশা ব্যতীত রাসূল (সা.)- এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সময় সকলেই বিধবা ছিলেন এবং তাদের মধ্যে অনেকেই যৌবনের উচ্ছলতা ও অভিলাষ হারিয়ে ছিলেন। আর এটাই এর সপক্ষে শ্রেষ্ঠ দলিল যে, রাসূল (সা.)- এর একাধিক বিবাহ বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হয়েছিল। সুতরাং রাসূলের প্রতি কুমন্ত্রণা ইত্যাদির অপবাদ প্রদান কখনোই যৌক্তিক হতে পারে না।

## নবুওয়াত লাভের পূর্বে মহানবী (সা.)- এর ব্যক্তিত্ব

### পারিপার্শ্বিকতার নীতি

মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, পরিবেশ, কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ও চিন্তা-চেতনার ভিত্তি রচনা করে এবং ‘পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধান ও অনুরূপ হওয়ার নীতি’ অনুসরণ তারা সামাজিক রীতি প্রথার পশ্চাদ্ধাবন করে।

যদিও এ ব্যাপারে একদল চরমপন্থা অবলম্বন করেছেন এবং এ মতবাদকে একটি সার্বিক ও সর্বজনীন নীতি বলে মনে করেছেন। তারা সকল সামাজিক বিষয় ও ঘটনাকে কোন প্রকার ব্যতিক্রম ব্যতীতই এ নীতির মাধ্যমে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তবে ব্যক্তির মন মানসিকতার উপর পরিবেশের প্রভাব অনস্বীকার্য।

অতএব, কল্যাণময় ও সংযমী পরিবেশ, সমাজের সন্তানদেরকে সংযমী ও সুশৃঙ্খল রূপে গড়ে তোলে। অপরদিকে বিচ্যুত ও কলুষিত পরিবেশ কোন না কোন ভাবে ব্যক্তিকে বিচ্যুতি ও অনাচারের দিকে ঠেলে দেয়। অতএব, যিনি স্বীয় পথকে কলুষিত পরিবেশ থেকে পৃথক করে থাকেন, নিঃসন্দেহে তিনি কোন সাধারণ ব্যক্তিত্ব নন।

## ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবের পরিবেশ

পৃথিবী, বিশেষ করে আরবভূমি তখন অজ্ঞতা ও অন্যায়ে সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিল এবং আরবের জনগণ কুসংস্কার ও অনাচারের আওনে জ্বলছিল। অজ্ঞতার কৃষ্ণকায় মেঘগুলো আরববাসীর জীবন-দিগন্তকে অন্ধকারে ঢেকে ফেলেছিল এবং তারা অন্ধকারের ঘনঘটায় জীবনাতিবাহিত করছিল। কতইনা সম্পদ লুটতরাজ হতো, কতইনা রক্ত অন্যায়ে ভাবে ঝরত।

নিকৃষ্টতম ব্যাপার ছিল, প্রাণহীন মূর্তিসমূহের উপাসনা। কুসংস্কার ও শ্রেণী বৈষম্য সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছিল। যার অস্তিত্ব সেথায় ছিলনা তা হলো ন্যায়পরায়ণতা ও নিয়ম শৃঙ্খলা। নিষ্ঠুর শক্তিদররা অন্যের শ্রম এবং বিধবা ও অনাথের ঘামের বিনিময়ে স্বীয় ধন সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলত। আর আত্মসুরিতা ও দাস্তিকতা প্রদর্শন করত এবং খেঁটে খাওয়া মানুষের উপর আগ্রাসন ও নিপীড়ন চালাত।

তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যনীতি এতটা খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছিল যে, অক্ষম স্বামীর ঋণের মোকাবিলায় তারা স্ত্রীকে দায়ী মনে করতো; আর যদি অক্ষম, অপারগ কোন স্ত্রীর নিকট ঋণ থাকত তবে তার জন্যে তার স্বামীকে গ্রেফতার করত।<sup>৪০</sup>

উৎকর্ষ ও জ্ঞানার্জনের কোন উদ্যোগ তাদের ছিলই না, বরং এর পরিবর্তে তাদের পূর্বপুরুষ ও লোক জনের সংখ্যাধিক্যের জন্যে অহঙ্কার করত। কখনো কখনো কোন গোত্রের জনবলের আধিক্য প্রমাণ করার জন্যে তারা গোরস্থানে যেয়ে কবরের সংখ্যা গণনা করে তাদের সংখ্যাধিক্য দেখাত।<sup>৪১</sup>

হিংসা বিদ্বেষ, কাম-ক্রোধ, মদ্যপান, রক্তারক্তি ছিল তাদের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

ইমরুল কাইস নামক এক বিখ্যাত আরব কবি, তার চাচাত বোন উনাইয়ার সাথে শয়তানী ও উন্মাদ প্রেম ঘটিত ঘটনাবহুল অতীত সম্পর্কে নির্লজ্জ ভাবে তার কবিতায় বর্ণনা করেছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এ কাব্যসমূহই সাহিত্য কর্মের নিদর্শন স্বরূপ কাবা ঘরের দেয়ালে টানানো হয়েছিল।

এটাই ছিল সে সমাজের জনজীবন ও আচার ব্যবহারের চিত্র, যে সমাজের অন্ধকারময় দিগন্ত থেকে ইসলামের জ্যোতি আত্মপ্রকাশ করেছিল।

নিঃসন্দেহে যিনি এহেন সমাজের রঙে রঞ্জিত না হয়ে, বরং এতে অস্বস্তি বোধ করতেন এবং এর বিরোধিতায় রত হতেন, তিনি এক মহান ও ঐশী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আর তিনিই জাতির নেতৃত্বের জন্যে এবং বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে মুক্তি দানের জন্যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত।



## নবীগণ (আ.) সমাজ গঠন করতেন, সমাজের অনুসরণ করতেন না

সকলেই মূর্তিনগরের দিকে ধাবিত হতো; কিন্তু মহানবী (সা.) কারো কাছে শিক্ষা গ্রহণ না করলেও<sup>৪২</sup> হেরা পর্বতের পথ বেছে নিয়েছিলেন। সেথায়, শক্তি ও মর্যাদার অধিকারী বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর সম্মুখে সিঁজদাবনত হয়ে তাঁরই উপাসনায় আত্মনিয়োগ করতেন।<sup>৪৩</sup>

হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর করুণার ছোঁয়ায় শৈশব থেকেই তাঁর পথ (সঠিকরূপে) নির্বাচন করে নিয়েছিলেন এবং কোন প্রকার উৎকর্ষা ও সন্দেহ ব্যতীতই স্বীয় গোত্রের ভ্রান্ত রীতিনীতি পরিহার করে চলতেন এবং এর বিপরীতে অবস্থান নিয়েছিলেন।<sup>৪৪</sup>

তিনি তাঁর জীবনের কোন মুহূর্তেই মূর্তি পূজা করেন নি, এমনকি ঐগুলোর নাম শুনতেও অনীহা প্রকাশ করতেন। যেমনটি ইতোপূর্বেও আমরা উল্লেখ করেছিলাম।

যখন হযরত মাত্র ১২ বছরের বালক ছিলেন এবং বোহাইরা তাঁকে দুটি কুখ্যাত মূর্তি লাভ ও ওজ্জার' কসম দিয়েছিল তখন তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন এবং সক্রোধে বলেছিলেন : আমি কোন কিছুকেই এ দুটির মত শত্রু মনে করি না।

তাঁর সততা ও মহত্বের খ্যাতি ছিল লোকের মুখে মুখে; তাঁর আচার, ব্যবহার ও বিশ্বস্ততার কারণে তিনি 'আল আমীন' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তাঁর এহেন কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের কারণেই, খাদিজা তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁর উপর ন্যস্ত করেছিলেন।

মহানবী (সা.)-এর আচার-আচরণ এতই মনোমুগ্ধ ও সমুন্নত ছিল যে, তা সকল মানুষকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করত।

আম্মার বলেন : নবুয়াতের পূর্বে আমি ও মুহাম্মদ (সা.) রাখালী করতাম। একদিন আমি প্রস্তুত দিলাম যে, ফাখের চারণ ভূমিতে গেলে ভাল হয়। মুহাম্মদ (সা.) আমার প্রস্তুবে সাড়া দিলেন। পরদিন সেখানে গেলাম। দেখলাম যে মুহাম্মদ (সা.) আমার পূর্বে সেখানে গিয়েছেন কিন্তু মেষগুলোকে সেখানে চরানো থেকে বিরত রাখছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কেন মেষগুলোকে

চরতে দিচ্ছেন না? তিনি বললেন : যেহেতু তোমার সাথে কথা দিয়েছিলাম তাই তুমি আসার পূর্বে আমার মেঘগুলো এ চারণ ভূমি থেকে আহার গ্রহণ করবে, তা পছন্দ করছিলাম না। এভাবেই মুহম্মাদ (সা.) অন্য এক পথে নিজেকে পরিচালিত করেছিলেন এবং গোত্রের রীতিনীতির অনুগামী হন নি। আর অদৃশ্যলোকের সাহায্যে স্বীয় উৎকর্ষের পথে অগ্রসরমান ছিলেন। আর এ জন্যেই মানুষ তাঁর প্রতি অধিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন এবং কোন সমস্যার সমাধানে তাঁর দেয়া সিদ্ধান্তের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন ও তাঁর অনুসরণ করতেন।

## হাজারুল আসওয়াদ স্থাপনের ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর সিদ্ধান্ত

মহানবীর বয়স ছিল তখন ৩৫ বছর। কোরাইশ কাবা অর্থাৎ আল্লাহর গৃহ পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করার জন্যে সিদ্ধান্ত নিল। যেহেতু কোরাইশের গোত্রসমূহের সকলেই এ গৃহ মেরামতকরণের মর্যাদার অধিকারী হতে চেয়েছিল, সেহেতু প্রত্যেকেই কাবার এক একটি অংশ মেরামত করার জন্যে ভাগাভাগি করে নিল।

প্রথমে ‘ওয়ালিদ’ গৃহ ভাঙ্গার কাজ শুরু করল। অতঃপর অন্যরা তাকে সাহায্য করল। ফলে ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক নির্মিত স্তম্ভগুলো দৃশ্যমান হলো। অতঃপর প্রত্যেক গোত্র কাবাগৃহের নির্দিষ্ট অংশ মেরামত করার জন্যে নির্ধারণ করে নিল। যখন কাবা গৃহের মেরামত কাজ এমন এক স্থানে পৌঁছল যেখানে হাজারুল আসওয়াদ স্থাপন করতে হবে, তখন কোরাইশের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে তুমুল বিবাদ শুরু হলো। কারণ প্রত্যেক গোত্রই স্বহস্তে এ কর্ম সম্পাদন করতে এবং এ মর্যাদার অধিকারী হতে চাইল।

ধীরে ধীরে এ বিরোধ প্রকট হতে লাগল এবং যুদ্ধ বাঁধার পর্যায়ে পৌঁছল। আব্দুদারের পুত্ররা একটি বৃহৎ পাত্র রক্তে পূর্ণ করে এবং তাতে হস্ত সমূহ নিমজ্জিত করে পরস্পরের খুনে রঞ্জিত হওয়ার জন্যে শপথ গ্রহণ করল।

এ ভয়ঙ্কর বিরোধ চার অথবা পাঁচ রাত্রি স্থায়ী হয়েছিল। অতঃপর আবু উমাইয়া কোরাইশের বয়োজ্যেষ্ঠতম ব্যক্তি বলল : আমার প্রস্তাব হলো এই যে, (আগামী কাল প্রত্যুষে) সর্বপ্রথমেই যে ব্যক্তি মসজিদের দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে, তাকে এ বিরোধের মীমাংসাকারী হিসেবে মেনে নিবে। তার এ প্রস্তাব সকলেই একবাক্যে গ্রহণ করল, যাতে সমস্যার সমাধান হয়।

কোরাইশ তার এ প্রস্তাব গ্রহণ করতঃ অপেক্ষা করতে লাগল যে, কে মসজিদের দ্বার দিয়ে প্রবেশ করছে। হঠাৎ দেখা গেল যে ইসলামের নবী (সা.) প্রবেশ করলেন। যখন তাদের দৃষ্টি তাঁর উপর পতিত হলো। বলল : এতো মুহাম্মদ, সে বিশ্বস্ত (আমীন), আমরা তার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে প্রস্তুত।

মুহাম্মদ (সা.) এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তিনি ঘটনার বিষয় সম্পর্কে অবহিত হয়ে বললেন : একটি জামা নিয়ে আস। কোরাইশরা যদিও তার উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারেনি তবু দ্রুত একটি জামা নিয়ে আসল। মহানবী (সা.) ঐ জামাটিকে বিছিয়ে দিলেন এবং ‘হাজারুল আসওয়াদকে’ এর মাঝে রাখলেন। অতঃপর বললেন : প্রত্যেক গোত্র এ জামার এক একটি অংশ ধর যাতে প্রত্যেকেই এ মর্যাদায় অংশীদার হতে পার। কোরাইশের প্রত্যেক গোত্র জামার চারদিকে ধরল। অতঃপর ঐ নির্দিষ্ট স্থানে বয়ে নিল, যেখানে পাথরটি স্থাপন করতে হবে। তখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) দেখলেন যদি এর সংস্থাপনের দায়িত্ব অন্যকে দেন, তবে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে। তাই তিনি স্বয়ং হাজারুল আসওয়াদ তুলে নিয়ে যথাস্থানে স্থাপন করলেন। আর এ উন্নত বিচারের মাধ্যমে বিরোধ সম্পূর্ণ রূপে দূর করলেন।

এ ঘটনা রাসূল (সা.)- এর মহান সামাজিক ব্যক্তিত্বের প্রমাণবহ। আর সে সাথে সঠিক চিন্তার মাধ্যমে এক রক্তাক্ত ভয়ঙ্কর গোলযোগের রক্তপাতহীন সমাধানের ক্ষেত্রে তাঁর সঠিক সিদ্ধান্ত ও সুবিচারের প্রকাশ ঘটায়।

আর এভাবেই অনুধাবন করা যায় যে, তিনি নবুওয়াতের জন্যে এবং পবিত্র ও ঐশী বিপ্লবের ধ্বজা ধারণ করার জন্যে যোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

## ଓହୀର ଅବତରଣ

## মুহাম্মাদ (সা.)- এর বিশ্বজনীন রেসালত

এখন পর্যন্ত আমরা মহানবী (সা.)- এর জীবনের পাতাসমূহ থেকে কিছু পাতা দেখেছি মাত্র এবং তাঁর ঘটনাবল্ল জীবনের কিছু ঘটনা সেখানে আমরা পড়েছি। এবার আমরা তাঁর জীবনেতিহাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর ঘটনাটি সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করব।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) চল্লিশ বছর যাবৎ এমন এক অভিভাবকহীন ও লাগামহীন জনসমাজে বসবাস করেছিলেন যেখানে সভ্যতা ও সংস্কৃতির লেশ- মাত্র ছিল না। আর সমাজের এহেন অবস্থা মহানবী (সা.)- এর কোমল হৃদয়কে ব্যথাতুর করে তুলত। মুহাম্মাদ (সা.) সমাজে অজ্ঞতার তিমির ব্যতীত কিছুই দেখতে পাননি। কাবায় যেতেন, দেখতেন, খোদার পরিবর্তে তারা মূর্তি পূজা করছে; কাবা ত্যাগ করে সমাজে আসতেন, সেখানের অবস্থা অবলোকনেও ব্যথিত হতেন; মানুষের মাঝে যেতেন, গোত্রের নিকৃষ্ট চিন্তা- চেতনা ও রীতিনীতি দেখে হৃদয় ভারাক্রান্ত হতেন; দরিদ্র নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের অবস্থা দেখে ক্লেষ ভোগ করতেন।

নারীদের নিকৃষ্টতম সামাজিক অবস্থান, মদ, জুয়া, নরহত্যা, অনাচার ইত্যাদির বিস্মৃতিতে নিদারুণ কষ্ট অনুভব করতেন।

যখন ব্যবসা- বাণিজ্য করতেন এবং মানুষের সাথে মেলামেশা করতেন, তখন মানুষের চারিত্রিক অবনতি তার কোমল হৃদয়কে ব্যথিত করত। তখন বাধ্য হয়ে বিশ্রাম ও ইবাদতের জন্যে এমন কোন স্থানে যেতেন, যেখানে তাঁর হৃদয় ক্লেশমুক্ত থাকে, তাঁর প্রাণে একটু সস্তি পেতে পারেন। এ জন্যে তিনি হেরা পর্বতে যেতেন এবং আল্লাহর রহমতের নিদর্শন ও সৃষ্টির প্রতি মনোনিবেশ করতেন।

## চল্লিশ বছর বয়সে হযরত মুহাম্মদ (সা.)

মুহাম্মদ (সা.) চল্লিশতম বছরে পদার্পণ করলেন এবং ঐশী ও বিশ্বজনীন রেসালতের দায়িত্ব পালন করার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করলেন। হঠাৎ তাঁর প্রতি ওহীর ফেরেশতা জিব্রাইল অবতীর্ণ হলেন এবং বললেন : পড়! ...মুহাম্মদ (সা.) বললেন : কী পড়ব? তিনি এক অভূতপূর্ব অনুভূতিতে নিমগ্ন হলেন। দ্বিতীয়বার একই শব্দ শুনতে পেলেন যে সুস্পষ্ট রূপে বলল : পড়, হে মুহাম্মদ!

তৃতীয়বার জিব্রাইল পুনরাবৃত্তি করে বললেন : তোমার প্রভুর নামে পাঠ কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত পিণ্ড থেকে, পড়, এবং তোমার প্রভু সর্বাপেক্ষা দয়ালু, যে প্রভু লিখতে শিখিয়েছেন এবং মানুষ যা জানতো না, তা তাকে শিখিয়েছেন।<sup>৪৫</sup>

এক অবর্ণনীয় আনন্দ ও উৎকর্ষা তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা, তাঁর অস্তিত্বকে বিমোহিত করে তুলেছিল। কারণ এক বৃহৎ ও সমুন্নত জগতের সাথে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ...ফেরেশতাদের সাথে ...জিব্রাইলের সাথে উর্ধ্বলোকের সাথে ...তাঁর আত্মা এক পবিত্র ও মহান আশ্রয়স্থলের সাথে নিবিড় ও সার্বক্ষণিক সম্পর্ক স্থাপন করল, তিনি স্বীয় অভ্যন্তরে নবুওয়াতের ক্ষমতা অনুভব করলেন এবং কোন প্রকার উৎকর্ষা ও উদ্বেগের লেশমাত্র তাঁর অস্তিত্বে পরিলক্ষিত হয়নি। যা ছিল তা হলো দৃঢ়তা ও প্রশান্তি।

তাহলে মুহাম্মদ (সা.) কি হেরা পর্বতে কোন প্রশিক্ষণকাল সম্পন্ন করেছিলেন? এটি সে প্রশ্ন, যার ইতিবাচক জবাব দিয়েছিলেন কোন কোন প্রাচ্যবিদ ও লেখক এবং বলেছিলেন : মুহাম্মদ (সা.) হেরা পর্বতের গুহায় ইঞ্জিল ও নবীগণের (আ.) বক্তব্য ও শিক্ষার উপর গভীর ভাবে গবেষণা ও পর্যালোচনা চালিয়েছিলেন এবং এ (জ্ঞান) জগতের অনেক স্বাদ আস্বাদন করেছিলেন।

এ কথার অর্থ দাঁড়ায় মুহাম্মদ (সা.) স্বশিক্ষিত কোন ব্যক্তি ছিলেন যিনি ইঞ্জিল ও তৌরাতের উপর গভীর অনুসন্ধান ও পড়াশুনার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে আবিষ্কার করেছিলেন!

কিন্তু এ ধারণার বিপরীতে অনেক প্রমাণ রয়েছে, এ গুলোর মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

যদি ইসলামের নবী (সা.) কোরআনকে ইঞ্জিল ও পূর্ববর্তী নবীগণের (আ.) শিক্ষা থেকে গ্রহণ করতেন, তবে সঙ্গত কারণেই কোরআনের বিষয়- বস্তুসমূহ ইঞ্জিল ও তৌরাতের সদৃশ হতো। অথচ কোরআনের বিষয় বস্তু তৌরাত ও ইঞ্জিল থেকে সামগ্রিক ও মৌলিক ভাবে পৃথক ও স্বতন্ত্র। কোরআনের বক্তব্য, প্রাঞ্জল ও অভূতপূর্ব ভাষাশৈলীর সম্মুখে তদানিস্তন ও পরবর্তী যুগের খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণও নতশির। আর এটাই প্রমাণ করে যে, ইসলামের নবী (সা.) সরাসরি বিশ্ব সৃষ্টি কর্তার সাথে সম্পর্কিত ছিলেন এবং নিঃসন্দেহে এ কথাগুলো ও বাক্যগুলো কোন পুস্তকেই বিদ্যমান ছিল না, যা থেকে নবী (সা.) উদ্ধৃতি দিবেন ও শিক্ষা নিবেন।

কোন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় না; বরং এ অপপ্রচারটি ছিল খ্রিস্টান পাদ্রী ও পাশ্চাত্যের উদ্দেশ্যপ্রবণ প্রাচ্যবিদদের সাজানো কথা।

যদি কোরআন বাইবেলের পুরাতন ও নতুন সংস্করণ থেকে অস্তিত্ব লাভ করত, তবে যারা কোরআনের বিরুদ্ধে কোন আয়াত উদ্ধৃতি করতে ও এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাইত, তাহলে, যে তৌরাত ও ইঞ্জিল তাদের হাতে ছিল তারা তাতে খুঁজে দেখত এবং কোন প্রকার কষ্ট ব্যতীতই স্বীয় লক্ষ্যে পৌঁছতে পারত।

সকলেই বিশ্বাস করেন যে, মুহম্মদ (সা.) (কারো নিকট) শিক্ষা গ্রহণ করেন নি।

কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি বিশ্বাস করবে যে, পড়াশুনা করেন নি এমন একজন ব্যক্তি, যিনি অজ্ঞ ও জ্ঞান বিজ্ঞানের পাঠ্য পুস্তক থেকে দূরে বিদ্যমান এক সমাজে বড় হয়েছেন, তিনি এক জ্ঞানগর্ভ ও বিশ্বজনীন পুস্তক উপহার দিয়েছেন? এ ধরনের ব্যক্তি বর্গের নিকট প্রশ্ন করা উচিত যে, কিরূপে ইসলামের নবী (সা.) তৌরাত ও ইঞ্জিলের উপর পড়াশুনা করতেন? যে ব্যক্তি তার সমস্ত জীবনে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যান নি, কোন শিক্ষাগুরুর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন নি, কিরূপে তিনি অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে সংবাদ দিতে পারেন?!



## ওহী কী?

যা সর্বজন স্বীকৃত তাতে বলা হয়, মহান আল্লাহ ও তাঁর নবী (আ.) গণের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল এবং তারা সকল বাস্তবতার জ্ঞান বিশ্ব সৃষ্টির উৎস (অর্থাৎ মহান আল্লাহ) থেকে লাভ করতেন। আর এ সম্পর্ক তাঁদের আত্মিক উৎকর্ষ ও দৃঢ়তার ফলে বিদ্যমান ছিল।

তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যদি নবীগণের (আ.) সাথে এ সম্পর্ক ছিন্ন করা হয় তবে তাঁদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। নবীগণের (আ.) সকল মর্যাদার কারণ হলো যে, তারা বিশ্ব সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্কের যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। সুতরাং তাঁরা যা বলতেন তাতে কোন প্রকার সন্দেহ ও জটিলতা ছিলনা। বরং কী এবং কোথা থেকে এসেছে এ সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন, যা কারো কারো তথাকথিত অন্তর্দৃষ্টির (كشف) দাবির ব্যতিক্রম যেখানে যোগ সাধনা ও অন্যান্য পদ্ধতি ও নিয়ামকের মাধ্যমে অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং এর অধিকারীদের নিকট এমন কিছু বিষয় অর্জিত হয় যে তারা জানে না কোথা থেকে এসেছে। বরং প্রায়শঃই ধারণা ও অনুমানের বশবর্তী আবার কখনোবা প্রকৃত অবস্থার ব্যতিক্রম হয়ে থাকে।

যাহোক, এ দলের (যোগী) উপর নবীগণের (আ.) শ্রেষ্ঠত্ব এতটা সুস্পষ্ট যে, কোন প্রকার ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কারণ আল্লাহর নবীগণ (আ.) যা বলেন ও দেখেন তা-ই বাস্তব ও সত্য। এমনকি উদাহরণত এক বিন্দু পরিমাণ সন্দেহও তাদের নিকট আশ্রয় পায় না। অতএব, ওহী হলো মহান আল্লাহ ও নবীগণের (আ.) মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তা-ই। আর এ সম্পর্ক কখনো কখনো জিব্রাইলের মাধ্যমে, আবার কখনো কখনো কোন প্রকার মাধ্যম ব্যতীতই সম্পন্ন হতো।

## ওহী কি এক ধরনের অসুস্থতা?

পাশ্চাত্যের কিছু কিছু লেখক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে আমাদের মহানবী এর উপর অবতীর্ণ -(.সা) ওহী সম্পর্কে প্রলাপ বকতে বাধ্য হয়েছেন এবং ওহীকে Hysteria নামক একধরনের অসুস্থতা ও রোগ বলে পরিচয় দেয়ার চেষ্টা করেছেন।<sup>৪৬</sup>

তবে সৌভাগ্যবশতঃ এ ধরনের অপবাদ এতটা উদ্ভট ও ভিত্তিহীন যে, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ে না। কারণ এ রোগের অনেক লক্ষণ বিদ্যমান যেগুলোর কোনটিই আমাদের প্রিয় নবী (সা.) মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। জন ডেভেন পোর্টের ভাষায় : বলা হয় যে, মুহাম্মদ (সা.) মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এটি হলো গ্রীকদের একটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভিত্তিহীন বক্তব্য। তারা এ ধরনের অপবাদের মাধ্যমে এক নব বিশ্বাসের প্রচারের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে এবং মহানবী (সা.)- এর চারিত্রিক বিশেষত্বের প্রতি খ্রিস্টবাদী সমাজে ঘৃণা ও ক্ষোভ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। তারা মহানবী (সা.)- এর প্রতি যে অপবাদ দিতে চেয়েছিল, তা যে সন্দেহাতীত ভাবে ভিত্তিহীন তার প্রমাণ হলো : ঐ ধরনের অস্থিরতা, উৎকর্ষা ও হৃদয় বিদারী আহাজারী যা মৃগী রোগের লক্ষণ তা কখনোই, এমন কি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার কঠিনতম অবস্থায়ও পরিলক্ষিত হয়নি।

এছাড়া, মৃগী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির যে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পর, সে যা দেখেছে ও শুনেছে তার কিছুই তার স্মরণে থাকে না। আর তা হযরত রাসূল (সা.)- এর অবস্থার ঠিক বিপরীত অবস্থা। কারণ তিনি ওহী অবতীর্ণ হওয়া অবস্থায় কোন কথা বলতেন না। তবে এ অবস্থা শেষ হলে তিনি তাঁর উপর অবতীর্ণ ওহী সম্পর্কে বক্তব্য দিতেন এবং যা কিছু দেখেছিলেন ও শুনেছিলেন তা ঘোষণা করতেন। অথচ এক মৃগী রোগী যে সকল কথা বলে সাধারণতঃ তা হলো তার কল্পনা সম্পর্কিত যা তার ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত মস্তিষ্কপ্রসূত। যেমন : রোগী এমন এক বিকট ও ভয়ঙ্কর চেহারা দেখতে পায় যে, তাকে হত্যা ও অত্যাচারের হুমকি দিচ্ছে। ফলে তার কথা বার্তা ও এ সম্পর্কিত হয়। অপরদিকে আজ অবধি

কেউই দেখেনি যে, একজন মৃগী রোগীর কথায় কোন বৈজ্ঞানিক, বিধি নিয়মগত ও দিকনির্দেশনা সম্বলিত কোন কথা খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। অথচ এখন পর্যন্ত চতুর্দশ শতাব্দী অতিক্রম করলেও ইসলামী বিধানে কোন ক্ষুদ্র পরিমাণের ত্রুটিও খুঁজে পাওয়া যায় নি।

## ওহী ও আধুনিক জ্ঞান- বিজ্ঞান

আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও আবিষ্কারের ফলে অনেকে যা ধারণা করেন, তার ব্যতিক্রমে সত্য ধর্ম ইসলামের গুরুত্ব ও মর্যাদার কিঞ্চিৎ ঘাটতি তো হয়নি বরং বিপরীতক্রমে এর ভিত্তি, মূলনীতিসমূহকে স্বীকৃতি ও দৃঢ় প্রতিপন্ন করেছে।

রাডার, বেতার ও টেলিগ্রাফ ইত্যাদির আবিষ্কার প্রমাণ করেছে যে, ওহীর ব্যাপারটি প্রাকৃতিক নিয়ম ও সৃষ্টি রহস্যের সাথে কোন প্রকার বিরোধ রাখে না। কারণ যে মহান আল্লাহ এ যোগাযোগ ব্যবস্থা পদ্ধতি মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন, সে মহান আল্লাহ তাঁর ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশেষ যোগাযোগ স্থাপন করতেও সক্ষম, যদিও তা এ আবিষ্কারের কোনটির মত নয় বা এগুলোর সাথে তুল্য নয়।

অনুরূপ ‘আত্মা উপস্থিত করণ বিদ্যা’ ম্যাগনেটিক স্বপ্ন, টেলিপ্যাথি ‘চিন্তা স্থানান্তর’ টেলি পিসিশি’ মানসিক প্রভাব ইত্যাদির আবিষ্কারে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মাণ হয়েছে যে, জগতের সৃষ্টি কেবলমাত্র স্পর্শযোগ্য বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

ইসলামী বিশ্ব তার মহান নেতা হযরত মুহাম্মদের (সা.) জন্যে গর্বিত। কারণ তিনি ঐশী কর্মসূচীর মাধ্যমে কেবলমাত্র তদানিন্তন বিশ্বকেই মুক্তি দেননি ও সৌভাগ্যবান করেন নি; বরং চৌদ্দ শতাব্দী পরও তা আধুনিক বিশ্ব সভ্যতার পথনির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে। আজও বিশ্বের জ্ঞানীজন প্রতিনিয়ত তাঁর মহান ও সুদূর প্রসারী নিয়ম ও দিকনির্দেশনাকে উত্তর উত্তর, ততোধিক উত্তমরূপে অনুধাবন করছেন।

## হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর প্রচার পদ্ধতি

যখন মহানবী (সা.) হেরা পর্বত থেকে নেমে আসলেন এবং গৃহ অভিমুখে যাত্রা করলেন তখন তিনি নিজেকে অন্য এক জগতে দেখতে পেলেন। হেরা পর্বতে যাওয়ার পূর্বে তিনি নবুওয়াতের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন না; কিন্তু দীর্ঘ দশ বছর সেখানে বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তার গভীর ইবাদতে মগ্ন থাকার পর তিনি আজ তাঁর পক্ষ থেকে এক গুরুদায়িত্ব স্বীকৃতি ধারণ করলেন। এক্ষেত্রে তাঁর কোন উৎকর্ষা ও ভয়-ভীতি ছিল না। জিব্রাইল (আ.)- এর দর্শন ও তাঁর এ সুসংবাদ যে ‘আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল, <sup>৪৭</sup> তা- ই তার রেসালাত লাভের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে যথেষ্ট ছিল। হযরত জিব্রাইল (আ.)- এর দর্শন সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

“রাসূলের অন্তর মিথ্যা প্রতিপন্ন করে নি যা সে দেখেছে।” (সূরা নাজম : ১১)

তাছাড়া মহান আল্লাহ যে কোন নবী অর্থাৎ যাকেই মানবতার মুক্তি ও পথনির্দেশনার জন্যে নির্বাচন করেন না কেন, তাকেই সুস্পষ্ট দলিল ও দৃঢ় প্রমাণের মাধ্যমে স্বীয় রেসালাত সম্পর্কে নিশ্চিত করে থাকেন, যাতে মানুষের সংস্কার ও উৎকর্ষের পথে মনোস্তির ও দৃঢ়তার সাথে চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারেন।

অতএব, একথা কতটা অনর্থক ও বিবেক বুদ্ধি বিবর্জিত যে বলা হয়, মুহাম্মদ (সা.) জানতেন না যে তিনি নবী হয়েছেন। অতঃপর যখন খাদিজার কাছে গেলেন ও তাঁর সাথে আলোচনা করলেন, তখন তিনি তাঁকে তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত করেছিলেন।

## হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর অপেক্ষায় খাদিজা

নবুওয়াত লাভের দিনের ঘটনা প্রবাহের কারণে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে বিলম্বে ঘরে ফিরতে হয়েছিল। খাদিজা এ ধরনের বিলম্ব অতীতে কখনো লক্ষ্য করেন নি বলে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন যে, মুহাম্মদ (সা.) মলিন শ্রান্ত বদনে গৃহে প্রবেশ করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন অদ্য কেন এত বিলম্বে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন? মহানবী (সা.) ঐ দিনের সকল ঘটনা হযরত খাদিজাকে খুলে বললেন। খাদিজা বহুদিন থেকে এরূপ একটি দিবসের অপেক্ষায় ছিলেন। কারণ স্বীয় গোলাম মাইসারার নিকট শুনতে পেয়েছিলেন যে, শামের পথে সফরের সময় খ্রিস্টান যাজক বলেছিলেন : তিনি উম্মতের নবী।<sup>৪৮</sup>

## বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে হযরত আলী (আ.) ছিলেন প্রথম পুরুষ

যে বছর আরবে কঠিন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, সে বছর হযরত আবু তালিবের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। মুহাম্মদ (সা.) অর্থনৈতিক ভাবে তার বোঝা লাঘব করার জন্যে আলী (আ.)-কে তাঁর আপন গৃহে নিয়ে আসলেন এবং একজন দয়ালু ও স্নেহাতুর পিতার ন্যায় তাঁকে লালনপালন করার চেষ্টা করেছিলেন। হযরত আলী (আ.), যিনি মহানবী (সা.)-এর গৃহে বসবাস করতেন এবং প্রত্যুৎপন্নমতিতা ও যোগ্যতার ক্ষেত্রে অনন্য ছিলেন, তিনি অন্তরাত্মা দিয়ে মহানবীর অনুসরণ করতেন। আর ইতোমধ্যে মহানবীর সততা ও নিষ্ঠার সাথে সুপরিচিত ছিলেন। এ কারণেই দশ বছর বয়সেই তিনি পূর্ণ সচেতনতার সাথে রাসূল (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। আর এ ভাবেই ইসলাম ও ঈমানের ক্ষেত্রে সকলকে পশ্চাতে ফেলে তিনি তার প্রথম স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন।

## নামাযের আদেশ

তাওহীদ ও একত্ববাদের পর মহানবী (সা.) ও তাঁর অনুসারীদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল তা ছিল নামায। এখানেই নামায যা মহান প্রভুর সাথে মানুষের সম্পর্কের পদ্ধতি ও আল্লাহর নেয়ামতের গুরুত্ব আদায়ের মাধ্যমে, তার মর্যাদা ও মূল্য প্রকাশ পায়। সুতরাং ইসলামের নেতৃবর্গ, বিশেষ করে মহানবী (সা.) নামাযের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান ও উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলতেন : নামায হলো দীনের স্তম্ভ। যদি কেউ নামাযকে হালকা ভাবে নেয় তবে সে অনন্তকালীন জীবনে তথা আখেরাতে আমাদের শাফায়াত ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে। যাহোক, মহান আল্লাহ জিব্রাইলের মাধ্যমে নামাযের শর্ত ও পদ্ধতি সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে অবহিত করলেন এবং তিনি খাদিজা ও হযরত আলীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। রাসূল (সা.) সমবেত হয়ে নামায অর্থাৎ জামায়াতের সাথে নামায আদায় করলেন।<sup>৪৯</sup>



## তিন বছর যাবৎ কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রচার

ইসলামের নবী (সা.) নবুওয়াত লাভের পর তিন বছর যাবৎ প্রচারের ক্ষেত্রে গোপন তৎপরতা চালিয়েছিলেন। কারণ আরবের কলুষিত সমাজে যেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী মূর্তি পূজা ও অংশীবাদ প্রচলিত ছিল, প্রকাশ্যে প্রচারের জন্যে ঐ সমাজের কোন প্রস্তুতি ছিল না। হযরত মুহাম্মদ (সা.) যদি নবুওয়াত লাভের প্রারম্ভেই এরূপ কর্ম করতেন, তবে অপরিসীম সমস্যার সম্মুখীন হতেন যা তাঁকে প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরিয়ে নিত। ফলে মহানবী (সা.) মূর্তি পূজারীদের সম্মুখে (যারা একাধিক খোদার উপাসনা করত ও তাদের তুষ্টির জন্য করতালি ও বাঁশি বাজাত) একক প্রভুর উপাসনা করতেন এবং আত্মিক পরিচিতি, একক প্রভুর হামদ ও প্রশংসার সমাহার নামায়ে মশগুল হতেন (তাদেরকে কিছু না বলে বা আহ্বান না করে)।

হযরত মুহাম্মদ (সা.), আলী (আ.) ও হযরত খাদিজাকে সাথে নিয়ে জনাকীর্ণ স্থানে যেমন : ‘মসজিদুল হারামে’ ও ‘মিনায়’ আসতেন এবং বিরোধীদের চোখের সম্মুখে সম্মিলিতভাবে নামায পড়তেন। আর এভাবে একাধিক খোদার উপাসনাকারী ধর্মের বিরুদ্ধে নির্বাক সংগ্রাম চালিয়ে যেতেন।<sup>৫০</sup>

তদানিন্তন বণিকদের একজন ‘আফিফ’ এরূপ বলে : আমি ব্যবসায়িক কাজে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আব্বাসের নিকট গিয়েছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলেন, আকাশে সূর্যের দিকে তাকালেন এবং কাবার দিকে নামাযে দাঁড়ালেন; কিছুক্ষণ পর একজন রমণী, একজন বালকসহ সেখানে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর সাথে নামায পড়লেন। আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করলাম : এ কোন দীন, যা সম্পর্কে আমি অজ্ঞাত?!

আব্বাস বললেন : এ ব্যক্তি হলেন হযরত মুহাম্মদ, আবদুল্লাহর সন্তান। তাঁর বিশ্বাস : তাঁর প্রভু তিনিই, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অধিপতি এবং মহান প্রভু তাঁকে মানুষের হিদায়াতের জন্যে নির্বাচন করেছেন। এখন পর্যন্ত এ তিনজন ব্যতীত এ দীনের অন্য কোন অনুসারী নেই। এ

নারীকে যে দেখতে পাচ্ছ, তিনি হলেন খুয়াইলিদের কন্যা খাদিজা; আর এ বালক হল আলী, আবু তালিবের পুত্র, তাঁর (মহানবীর) প্রতি অনুরক্ত হয়েছে। মুহাম্মদ (সা.) এভাবেই এগিয়ে চললেন। ধীরে ধীরে মুসলমানরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং ইসলাম বিরোধীদেরকে হতাশ করে দিয়ে বিস্তৃতি পেতে লাগল। যখন প্রকাশ্য প্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো তখন মুহাম্মদ (সা.) সে জন্যে আদিষ্ট হলেন।

## নিকটাত্মীয়দেরকে নিমন্ত্রণ ও প্রথম মুজিয়াহ

রাসূল (সা.)- এর নির্বাক প্রচারকার্য ও ভক্তদের উত্তর উত্তর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রকাশ্য প্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো। মহান আল্লাহ্ ইসলামের নবীকে তাঁর নিকটাত্মীয়দেরকে আহ্বান করতে নির্দেশ দিলেন<sup>৩১</sup> যাতে ছিদ্রান্বেষীরা বলতে না পারে যে, কেন নিকটাত্মীয়দেরকে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছ না এবং তাদেরকে একক খোদার উপাসনার দিকে আহ্বান করছ না। এছাড়া তাদের সহযোগিতায় ইসলামের অগ্রগতিতে বিস্তৃত ক্ষেত্রের সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং মহানবী (সা.) হযরত আলীকে খাবার প্রস্তুত করতে এবং তাঁর নিকটাত্মীয়দের মধ্যে প্রায় চল্লিশজনকে নিমন্ত্রণ করার নির্দেশ দিলেন।

হযরত আলী (আ.) খাবার প্রস্তুত করার পর তাদেরকে দাওয়াত করলেন এবং সকলেই উপস্থিত হলে এমন পরিমাণে খাবার উপস্থিত করা হলো যা একজনের জন্যেও যথেষ্ট ছিল না। সকলেই তৃপ্তি সহকারে আহ্বার গ্রহণ করল অথচ ঐ খাবারের কোন অংশ হ্রাস পেল না। এ বিষয়টি সকলের বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল। কিন্তু আবু লাহাব নির্বোধের মত বলল : ‘এ কর্মটি যাদু ব্যতীত কিছু নয়’। অথচ যাদু কখনোই মানুষকে তৃপ্ত করতে পারে না।

মুহাম্মদ (সা.) ঐ দিন কোন কথা বলেন নি। সম্ভবত এ নীরবতা এজন্য ছিল যে, তাদের জন্যে যাতে মুজিয়াহ ও যাদুর পার্থক্য নিজে থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। কারণ যদি এটি যাদু হতো তবে গৃহ থেকে প্রস্থান করার সাথে সাথেই তারা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ত।

যাহোক, যেহেতু এ সভাটি সফল হয়নি সেহেতু মহানবী (সা.) দ্বিতীয়বারের মত তাদেরকে আগামী দিনের জন্যে নিমন্ত্রণ করলেন এবং সেদিনের মতই তৃপ্তি সহকারে আহ্বার করালেন।

অতঃপর মহানবী (সা.) বললেন : ওহে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানগণ, মহান আল্লাহ্ আমাকে তোমাদের জন্যে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। তোমরা মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার অনুসরণ কর, যাতে কল্যাণ লাভ করতে পার। আল্লাহর শপথ, আমি আরবে এমন কাউকে চিনি না যে আমার চেয়ে উত্তম কোন কিছু তোমাদের জন্যে এনেছে। আমি

তোমাদের জন্যে পৃথিবী ও আখেরাতের কল্যাণ এনেছি। মহান আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর দিকে আহ্বান করার জন্যে আমাকে আদেশ দিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আমাকে এ কর্মে সাহায্য করবে? তোমাদের মধ্যে যে আমাকে এ কাজে সাহায্য করবে সে আমার ভাই, উত্তরাধিকারী ও আমার স্থলাভিষিক্ত হবে। আলী (আ.) ব্যতীত কেউই তাদের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া দেয় নি। আলী (আ.) ছিলেন বয়সে তাদের সকলের কনিষ্ঠ। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে সাহায্য করব। হযরত মুহাম্মদ (সা.) আলী (আ.)- কে বসিয়ে দিলেন এবং একই কথা তিনবার ঘোষণা করলেন কিন্তু আলী (আ.) ব্যতীত কেউই তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয় নি।

অতঃপর মহানবী (সা.) আলী (আ.)- এর প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বললেন : তোমাদের মধ্যে সে আমার ভাই, স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি ও আমার উত্তরাধিকারী। তার কথা তোমরা শ্রবণ করবে এবং তাকে অনুসরণ করবে।<sup>৫২</sup>

আর এ দিবসেই একদল লোক ইসলামের নবীর প্রতি ঈমান এনেছেন। কিন্তু অজ্ঞতা ও গোঁড়ামীর কারণে তাঁর আত্মীয়- স্বজনদের মধ্যে সকলেই ঈমান আনতে পারে নি, তা সত্ত্বেও মহানবীর প্রতি তাদের সহযোগিতা ও তার পক্ষ অবলম্বনের ক্ষেত্রে একেবারে নিষ্ফল ছিল না।

এ ঘটনায় স্বল্প খাবারের মাধ্যমে চল্লিশ জনের পরিতৃপ্ত পানাহার ব্যতীতও অন্য একটি বিষয় লক্ষণীয় ছিল। আর তা হলো এই যে, ঐ দিন মহানবী (সা.) হযরত আলী (আ.) সম্পর্কে যে কথাগুলো বলেছিলেন তাতে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, খেলাফত এবং উত্তরাধিকারের মর্যাদা একমাত্র হযরত আলী (আ.)- এর জন্যেই ছিল এবং তাঁকেই ইসলামের নবীর উত্তরাধিকারী বলে মনে করতে হবে।

আর এরূপেই সর্বজনীন ভাবে ও প্রকাশ্যে প্রচারকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো। হযরত মুহাম্মদ (সা.) অক্লান্ত পরিশ্রম চালিয়ে যেতে লাগলেন, একমুহূর্ত স্থির থাকেন নি। আর তখন থেকেই ইসলামের পতাকা সশব্দে উড্ডীয়মান হলো এবং সত্য অগ্রসরমান হতে শুরু করল।

## হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর সর্বজনীন প্রচার কার্য

মহানবীর নবুওয়াত লাভের তিন বছর অতিক্রান্ত হলো। তিনি এ সময়ে গোপনে ঐ সকল পথভ্রষ্ট, যারা পথনির্দেশনা পাওয়ার যোগ্য তাদের মধ্যে প্রচার কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নি। যখনই দেখতেন কোন অসহায় চারিত্রিক অবক্ষয় ও বিচ্যুত বিশ্বাস ও অংশীবাদের কর্দমায় নিমজ্জিত, তাকেই মুক্তি দেয়ার জন্যে চেষ্টা করতেন। স্নেহ মমতার দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতেন এবং আকর্ষণীয় যুক্তিতে তাকে একত্ববাদের দীনের প্রতি আহ্বান করতেন।<sup>৫০</sup>

কিন্তু যেহেতু তার দীন এক বিশ্বজনীন দীন এবং সংগত কারণেই এর আহ্বান বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছতে হবে, তাই প্রকাশ্যে প্রচার কার্য চালাতে শুরু করলেন এবং প্রকাশ্যে তাঁর উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী ঘোষণা করলেন।

## সাফা পর্বতে মহানবীর বক্তব্য

ইসলামের নবী (সা.) তাঁর দীনের প্রসারের জন্যে এবং আরবের সকল গোত্রের নিকট তা প্রচার করার জন্যে আল্লাহর আদেশক্রমে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের জন্যে এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্যে স্বীয় দীনের সত্যতা সম্পর্কে ঘোষণা দিতে সিদ্ধান্ত নিলেন।

আর এ উদ্দেশ্যে তিনি সাফা পর্বতের দিকে রওয়ানা করলেন এবং এ পর্বতের সর্বোচ্চ স্থানে আরোহণ করলেন। অতঃপর সেখানে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললেন : ইয়া সাবাহাহ!<sup>৫৪</sup>

রাসূল (সা.)- এর কথা সাফা পর্বতে প্রতিধ্বনিত হলো এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বিভিন্ন গোত্র থেকে অসংখ্য জনসমষ্টি তাঁর দিকে ধাবিত হলো। মহানবীর বক্তব্য শুনার জন্যে তারা তাঁর প্রতি নিবদ্ধ করল। মহানবী (সা.) তাদের দিকে ফিরে বললেন :

হে লোক সকল! যদি তোমাদেরকে সংবাদ প্রদান করি যে, শত্রুরা দিবা অথবা রাত্রিতে তোমাদের অজ্ঞতাবশতঃ তোমাদের উপর আক্রমণ করবে, তবে তা বিশ্বাস করবে কি?

সকলেই জবাবে বলল : আমরা আপনার সমগ্র জীবনে আপনাকে কখনো মিথ্যা বলতে শুনি নি।

নবী (সা.) বললেন : ওহে কোরাইশ জনগণ! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাবের ভয় প্রদর্শন করছি। নিজেকে আগুন থেকে মুক্তি প্রদান কর...।

অতঃপর বললেন : আমার অবস্থান সে পাহারাদারের মত যে শত্রুকে দূর থেকে দেখতে পায় এবং স্বীয় গোত্রকে তাদের আক্রমণ থেকে সতর্ক করে দেয়, ওহে! এমন কেউ কি কখনো তার গোত্রকে মিথ্যা বলতে পারে?

হয়ত রাসূল (সা.)- এর কথাগুলো উপস্থিত মানুষের অন্তরে স্থান নিতে পারে, এ ভয়ে আবু লাহাব নীরবতা ভঙ্গ করল এবং হযরতকে উদ্দেশ্য করে এরূপ বলল : পরিতাপ! আমাদেরকে এ ধরনের কথা শুনানোর জন্যেই কি এখানে সমবেত করেছ?

সে কঠোর ভাষায় অভদ্রোচিতভাবে মহানবীর কথায় বিঘ্ন সৃষ্টি করল এবং তার কথা শেষ করতে দিল না। এ সীমালঙ্ঘন, অসভ্য আচরণ এবং শত্রু ও মুশরিকদের সাথে সহযোগিতা করার শাস্তি হিসেবে মহান আল্লাহ্ তাকে অভিশম্পাত করে সূরা লাহাব অবতীর্ণ করলেন :

(تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ)

## মহানবী (সা.)- এর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া

মহানবী (সা.)- এর যৌক্তিক ও উষ্ণ বক্তব্য শ্রোতাদের অনেকের উপরই প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং সকল সভা সম্মেলনেই হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর নতুন দীনের কথা আলোচিত হচ্ছিল। অত্যাচার ও নিপীড়নের যাঁতাকলের নীচে যাদের কোমর নুঁয়ে পড়েছিল এবং মক্কার শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা ও অন্যায়ে ফলে যাদের প্রাণ ওষ্ঠাধারে সংলগ্ন হয়েছিল, মহানবীর বক্তব্য তাদের সম্মুখে আশার নতুন দিগন্ত খুলে দিল যেন তারা নতুন প্রাণ ফিরে পেল। কিন্তু কুচক্রী কোরাইশ দলপতিরা অনড় থাকল। কারণ তারা দেখল যে, ইসলামের নবী (সা.) যখনই সুযোগ পান, তাদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন। ফলে তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, যেভাবেই হোক না কেন এ বিপ্লবের পথ রোধ করতে হবে।

তারা এটা খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, অংশীবাদ ও মূর্তি পূজার মূল উৎপাটিত হলে এবং সকল মানুষ মহান প্রভু ও একত্ববাদের ছায়ায় আশ্রয় নিলে কিংবা কল্যাণময় দীন ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়লে, অত্যাচার ও শোষণের আর কোন পথ খোলা থাকবে না।

ফলে তারা একটি সমিতি গঠন করল এবং মহানবীর আন্দোলনকে প্রতিহত করার উপায় ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনায় বসল।

এ আলোচনার মাধ্যমে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, সকলেই কোরাইশের মান্যবর হযরত আবু তালিবের (যিনি রাসূলের পিতার মত ছিলেন) গৃহে যাবে এবং তাকে বলবে : যে ভাবেই তিনি ভাল মনে করেন সে ভাবেই যেন মুহাম্মদকে তাঁর পথে অগ্রসর হতে বাধা প্রদান করেন।

ফলে তারা এ উদ্দেশ্যে হযরত আবু তালিবের নিকট গেল এবং তিনি তাদের সাথে কথোপকথন করলে তারা স্বস্তি পেল।



## কোরাইশদের হযরত আবু তালিবের নিকট অভিযোগ

দ্বিতীয় বারের মত কোরাইশের গোত্রপতিরা আবু তালিবের গৃহে গেল। সমিতির মুখপাত্র নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করল :

আপনি আমাদের মধ্যে এবং কোরাইশের সকলের মধ্যে অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আপনি আমাদের নেতা, আমাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও বয়োবৃদ্ধ। আপনার উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। ইতোপূর্বেও আমরা আপনার নিকট চেয়েছিলাম যে, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের আচার- আচরণে ও কর্মকান্ডে বাঁধ সাধবেন।

আমরা আপনাকে বলেছিলাম : মুহাম্মদকে আমাদের পিতৃ পুরুষের দীনের প্রতি অকথ্য বলা থেকে ও আমাদের খোদাদের ত্রুটি তুলে ধরা থেকে এবং আমাদের বিশ্বাস ও চিন্তা- চেতনার অবাধ্য হওয়া থেকে বাধা প্রদান করতে। আপনি আমাদের এ আবেদনের প্রতি কোন প্রকার সাড়া প্রদান করেন নি এবং তাঁকে বাধা প্রদান করেন নি। খোদার শপথ! আমরা আমাদের পিতৃপুরুষের প্রতি অপবাদ দান ও আমাদের বিশ্বাসকে নীচ বলে গণনা করণ ও আমাদের খোদাদের দোষ- ত্রুটি অশ্বেষণের ক্ষেত্রে নীরব থাকতে পারি না। মুহাম্মদকে এ কর্ম থেকে আপনাকে বিরত রাখতে হবে; নতুবা আমরা তাঁর ও আপনার (তাঁর সাহায্যকারী) সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হব যাতে দু'দলের এক দল ধ্বংস হয়ে যায়।

হযরত আবু তালিব সন্ধির দ্বারে পা রাখলেন এবং তারা প্রস্থান করার পর বিষয়টি মহানবী (সা.)- এর কর্ণগোচর করলেন। মহানবী (সা.) তাঁকে উদ্দেশ্য করে এরূপ বললেন :

আল্লাহর শপথ! যদি আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্রকেও দেয়া হয় এ শর্তে যে, আমি ইসলামের প্রচার থেকে বিরত থাকব এবং আমার উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হব, তবে কখনোই আমি তা করব না। বরং এ পথে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব অথবা আমার লক্ষ্য আমি পৌঁছব। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) মনক্ষুন্ন হয়ে চাচার নিকট থেকে বিদায় নিলেন।

আবু তালিব তাকে ডাকলেন এবং বললেন : আল্লাহর শপথ! তোমাকে সাহায্য করা থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও বিরত থাকব না এবং তাদেরকে কখনোই তোমার ক্ষতি করতে দিব না।<sup>৫৫</sup>

পুনরায় কোরাইশ আমাদের ইবনে ওয়ালীদকে সঙ্গে নিয়ে হযরত আবু তালিবের নিকট আসল এবং বলল যে, এ যুবক শক্তিশালী ও সুদর্শন, আমরা তাকে আপনার নিকট প্রদান করব, যাতে আপনি তাকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করবেন এবং মুহাম্মদকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবেন। হযরত আবু তালিব খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন : খুব খারাপ কর্মের পরামর্শ আমাকে দিচ্ছ; আমি তোমাদের সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ করব অথচ আমার নিজের সন্তানকে তোমাদেরকে দিব যাতে তোমরা তাকে হত্যা করতে পার। আল্লাহর শপথ! এমনটি কখনোই হবে না।<sup>৫৬</sup>

## কোরাইশ কর্তৃক লোভ প্রদর্শন

কোরাইশবর্গ মনে করেছিল যে, বস্তুগত চাওয়া পাওয়া ও দেহহাম বা দিনারের মাধ্যমে ইসলামের সম্মানিত নবীকে তাঁর কর্মকান্ড থেকে বিরত রাখতে পারবে। তাই তারা মহানবীর নিকট আসল এবং বলল : যদি অর্থ ও সম্পদ চাও তবে তোমাকে আরবের সম্পদশালী ব্যক্তিতে পরিণত করব, যদি মর্যাদা ও নেতৃত্ব চাও তবে আমরা সকলেই নিঃশর্ত ভাবে তোমার নেতৃত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত; যদি রাজত্ব চাও তবে আমরা তোমাকে আমাদের বাদশা হিসেবে মেনে নিব। তোমার যে অবস্থা হয় এবং যাকে তুমি ওহী বলে বর্ণনা কর যদি বল যে, তুমি এ থেকে মুক্ত হতে অক্ষম, তবে তোমার চিকিৎসার জন্যে আমরা শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক তোমার জন্য উপস্থিত করব। তবে শর্ত হলো এই যে, তোমার প্রচারকার্য থেকে বিরত হও এবং মানুষের মধ্যে এর চেয়ে বেশী বিরোধ সৃষ্টি করো না। আমাদের খোদাদের বিশ্বাসের ও পূর্ব পুরুষের চিন্তা চেতনাকে তুচ্ছ জ্ঞাপন করো না।

মহানবী (সা.) জবাবে তাদেরকে বললেন :

তোমাদের সম্পদের প্রতি না আমার কোন লোভ আছে, না পদ মর্যাদার প্রতি, না তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করার প্রতি। মহান আল্লাহ আমাকে নবী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন এবং আমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে সুসংবাদ দান ও সতর্ক করার জন্যে আদিষ্ট হয়েছি। আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি; যদি তোমরা আমাকে অনুসরণ কর তবে কল্যাণ লাভ করবে। আর যদি গ্রহণ না কর, তবে ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য্য ও স্তৈর্য্য অবলম্বন করব, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের ও আমাদের মধ্যে তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন।

অবশেষে কোরাইশের গোত্রপতিরা এ মর্মে সিদ্ধান্ত নিল যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রস্তাব দিবে যাতে করে তিনি তাদের খোদাদের থেকে নিষ্ক্রিয় থাকেন, এতে তারাও হযরতের কাজে বাধা প্রদান করবে না। সুতরাং তারা হযরত আবু তালিবের নিকট গেল এবং তার নিকট চাইল,

তিনি যাতে তাদের প্রস্তাবটি মহানবীর নিকট উপস্থাপন করেন। মহানবী (সা.) তাদেরকে জবাবে বললেন :

যা তাদের জন্য উত্তম, যাতে তাদের জন্যে কল্যাণ নিহিত, যার মাধ্যমে তারা সৌভাগ্যের অধিকারী হবে আমি কি সে কথাটি বলা থেকে বিরত থাকব?

আবু জেহেল বলল : এক কথা তো ভাল কথা, আমরা দশটি কথা বলতেও প্রস্তুত। অতঃপর সে জিজ্ঞাসা করল সে কথাটি কী ?

মহানবী (সা.) বললেন : বল , لا اله الا الله (আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই রাসূল (সা.)- এর কথায় কোরাইশের গোত্রপতিরা খুব ক্ষুব্ধ হলো এবং তারা হতাশ হয়ে পড়ল।

আবু জেহেল বলল : এ কথাটি ব্যতীত অন্য কোন কথা বল। রাসূল (সা.) দৃঢ় কণ্ঠে বললেন : যদি সূর্যকেও আমার হাতে এনে দাও, তারপরও তোমাদের নিকট এ কথা ব্যতীত আমার আর কিছু চাওয়ার থাকবে না।

কোরাইশ গোত্রপতিরা যখন বুঝতে পারল, মহানবীর সাথে সংলাপে কোন ফল হবে না এবং লোভ দেখানো, হুমকি সত্ত্বেও তিনি যে পথ বেছে নিয়েছেন, তা থেকে বিরত হবেন না। ফলে তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, মহানবীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

## চলার পথে প্রতিবন্ধকতা এবং কুরাইশদের নির্যাতন

রাসূল (সা.) যে দিন থেকে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন, সে দিন থেকেই কোরাইশরা হযরতের প্রচার কার্যকে স্থগিত করার জন্যে সকল প্রকার পন্থা কাজে লাগায়।

সাধারণ নিয়মানুযায়ী তারা প্রথমে প্রলোভন দেখিয়ে এবং পার্থিব মর্যাদা, ধনসম্পদ ইত্যাদির ওয়াদা দিয়ে শুরু করেছিল। অতঃপর এ পথে ব্যর্থ হয়ে হুমকি প্রদান এবং অত্যাচার ও নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছিল।

এভাবে হযরত মুহম্মাদ (সা.)-এর জীবনের এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। সম্মান, শ্রদ্ধা, আখলাক-চরিত্র সমাজ থেকে উঠে গিয়ে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতায় পরিপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। যার মাধ্যমে তারা কাপুরুষোচিত ভাবে ইসলামের প্রচার প্রসারে বাঁধ সাধন করতঃ কোরাইশ নেতাদের সম্মান অটুট রাখার চেষ্টা করেছিল।

অবশ্য এটা অস্বীকার করা যায় না যে, অজ্ঞতা এবং চিন্তার অপরিপক্বতার কারণেই তারা সত্য পথ ও রাসূল (সা.)-এর দাওয়াতের বিরোধিতা করত। তবে কোরাইশদের অত্যাচার আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল তখন, যখন শুনেছিল যে রাসূল (সা.) তাদের কাঠ ও পাথর নির্মিত মূর্তিসমূহকে অবজ্ঞা করেন এবং বলেন : এই নিস্পাণ পাথরের টুকরার কাছে তোমরা কি চাও?

কাষ্ঠ ও প্রস্তর নির্মিত খোদাসমূহ যা কোরাইশরা (মুশরিক) তাদের পৈত্রিক সূত্রে পেয়েছিল তার প্রতি রাসূল (সা.)-এর প্রতিবাদ তাদেরকে বেশী অসন্তুষ্ট করেছিল।

অপর দিকে নতুন নবীর আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা তাদের শ্রেণী বৈষম্যের স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল না। কোরাইশ নেতারা এবং গোত্রপতিরা একাধারে দুর্বল শ্রেণী ও দাসদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যেতে চেয়েছিল। সুদখোর সম্পদশালীরাও চেয়েছিল সুদ গ্রহণের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর লোকদের রক্তচুষে খাওয়াকে অব্যাহত রাখতে।

শক্তিশালী এবং উদ্ধত লোকেরা চেয়েছিল তলোয়ার এবং বর্শার জোরে অসহায় ও দুর্বল মানুষের সম্পদ ও সম্মম হরন করাকে অব্যাহত রাখতে। সামাজিক এ ভ্রান্ত প্রথার বিরুদ্ধে নতুন আইনের

যে সংগ্রাম ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের ব্যাপক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। কেননা এর মাধ্যমে তাদের স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটেছিল।

আধুনিক দাওয়াতের বিরোধীদের শীর্ষে ছিল নামধারী গোত্রপতিরা যেমন : আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান, আবু লাহাব, আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুছ, আস ইবনে ওয়ায়েল, উতবা, শাইবা, ওয়ালিদ ইবনে মুগাইরা এবং উকবা ইবনে আবি মুয়িত।

কাপুরণমোচিত অপবাদ, শারীরিক নির্যাতন কটু ভাষায় গালাগাল, অর্থনৈতিক চাপ ইত্যাদি নির্লজ্জ উপায়ে তারা রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহায্যকারীদের বিরোধিতা করত। নিম্নে এর কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো :

১. একদা কিছু সংখ্যক কোরাইশ নেতা তাদের চাটুকারদেরকে দুস্বার নাড়ি ভূড়ি নিয়ে রাসূল (সা.)- এর মাথা ও মুখে ফেলার নির্দেশ দেয়। তারাও তাদের পাপিষ্ঠ নেতাদের নির্দেশ অনুযায়ী এ জঘন্য কার্য সম্পাদন করে, <sup>৫৭</sup> আর এভাবে মহানবী (সা.)- কে ব্যথিত করে।

২ : কে দেখলাম জনগণের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বলছিলেন -(সা) রাসূল : তারেক মুহারেবী বলেন.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلَحُوا

“হে লোক সকল, বল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তাহলে মুক্তি প্রাপ্ত হবে।”

তিনি জনগণকে ইসলাম ও একত্ববাদের দিকে আহ্বান করছিলেন। আবু লাহাব রাসূল (সা.)- এর পিছন পিছন আসছিল এবং তাঁকে পাথর ছুড়ে মারছিল। এত বেশী পাথর মেরেছিল যে, রাসূল (সা.)- এর পা দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছিল। রাসূল (সা.) এসব উপেক্ষা করে একাধারে জনগণকে সরল পথ প্রদর্শন করে যাচ্ছিলেন। আবু লাহাবও চিৎকার দিয়ে বলছিল : লোক সকল, এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। তার কথায় কর্ণপাত করো না।<sup>৫৮</sup> রাসূল (সা.) ব্যতীত অন্যান্য নব্য মুসলমানরা ও অমানবিক নির্যাতনের শিকার হতেন।

৩. একদা রাসূল (সা.) আম্মার ইয়াসির ও তার পরিবারকে দুশমনদের হাতে নির্যাতিত হতে দেখে বললেন :

হে আমার পরিবার, তোমাদের প্রতি সুখবর হলো যে তোমাদের স্থান বেহেশত।<sup>৫৯</sup> ইবনে আসির লিখেছেন যে, আমার ও তার পিতা-মাতা মুশরিকদের কঠোর নির্যাতনে পতিত হয়েছিল। মুশরিকরা তাদেরকে প্রচণ্ড গরম আবহাওয়ায় ঘর থেকে বের করে সূর্যের প্রচণ্ড তাপে শাস্তি দিত, যেন তারা নতুন দীন থেকে হাত গুটিয়ে নেয়।

আম্মারের মাতা সুমাইয়া হলেন ইসলামের প্রথম শহীদ। তিনি আবু জেহেলের হাতিয়ারের আঘাতে শহীদ হয়েছিলেন। আম্মারের পিতা ইয়াসিরও অবশেষে প্রচণ্ড নির্যাতনের মধ্যে শাহাদাত বরণ করেন। আম্মার নিজেও প্রচণ্ড নির্যাতনের শিকার হয় কিন্তু তাকিয়ার (স্বীয় বিশ্বাসকে গোপন করার) মাধ্যমে মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি পায়।

৪.বেলাল হাবশী কৃতদাস ছিলেন। তিনিও মহানবী (সা.)-এর অনুসারী ছিলেন। আর এ কারণে তার মনিব তাকে খুবই নির্যাতন করত। প্রখর রোদ্দের মধ্যে উত্তপ্ত বালির উপর শুইয়ে বুকের উপর বিরাটকায় পাথর চাপা দিয়ে রাখত। যেন এর মাধ্যমে সে রাসূলকে ত্যাগ করে মূর্তি পূজায় লিপ্ত হয়।

বেলাল সকল ছমকি এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাদেরকে বার বার একই জবাব দিত : আহাদ, আহাদ! অর্থাৎ (একত্ব, একত্ব) আল্লাহ এক এবং আমি আর কখনোই শিরক ও মূর্তি পূজায় প্রত্যাবর্তন করব না।

পরিতাপের বিষয় হলো এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা রাসূল (সা.) ও মুসলমানদের প্রতি যে নির্যাতন হয়েছিল তার বিশদ বিবরণ দিতে পারব না। মোটের উপর এ ভাবে বলা যায় যে, ইসলামের শত্রুরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সকল পন্থাই কাজে লাগিয়েছিল। মোটামুটি ভাবে সেগুলোকে এ ভাবে তুলে ধরা যেতে পারে :

**১: অর্থনৈতিক অবরোধ.** কোরাইশরা রাসূল (সা.) ও তাঁর সাথীদের উপর এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক অবরোধ চাপিয়ে দিয়েছিল। অর্থনৈতিক চাপ এবং মুসলমানদের সাথে যে কোন প্রকার লেনদেন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা ছিল মুসলমানদের সাথে তাদের অপর এক কাপুরুষোচিত আচরণ।

২: মানসিক উৎপীড়ন. কোরাইশদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ এবং যে কোন প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ। আর মহানবী (সা.)- কে জাদুকর ও মিথ্যাবাদী হিসাবে চিহ্নিত করা। এর সবই ছিল মুসলমানদের অবিচলতাকে নষ্ট করার পথে এক মনস্তাত্ত্বিক সংগ্রাম।

৩: অত্যাচার এবং দৈহিক নির্যাতন. এটা অপর এক অমানবিক মাধ্যম যা কোরাইশরা মুসলমানদের আন্দোলনকে থামিয়ে দিতে এবং তাদের নেতাকে নির্মূল করতে ব্যবহার করেছিল। এই কাপুরণমোচিত মাধ্যম যা ইসলামের প্রথম দিকের কিছু সংখ্যক মুসলমানের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে ইসলামের অগ্রগতির সাথে সংগ্রাম করতে এটা ছিল আর এক পস্থা।

কোরাইশরা ইসলাম, রাসূল (সা.) এবং মুসলমানদের সাথে সংগ্রামে সকল প্রকার অমানবিক উপায় ব্যবহার করা সত্ত্বেও ইসলাম একই ভাবে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) সঠিক পথে দাওয়াত চালিয়ে যান এবং মুসলমানরাও সঠিক পথে চলতে থাকেন।

তাঁরা এ গৌরবময় পথে অসংখ্য সমস্যা, নিদারণ যন্ত্রণা, নির্যাতন, অপ্রীতিকর যন্ত্রণা, কষ্ট, হিজরত ইত্যাদির সম্মুখীন হয়; আর এর মাধ্যমে তাদের ঈমান ও আকিদা রক্ষা করেন।

যে লক্ষণীয় বিষয়টি ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে পাওয়া যায় তা হলো ইসলামের শত্রুদের অপপ্রচারের বিপরীত। ইসলামের অগ্রগতি তরবারীর জোরে হয় নি। বরং ১৩ বৎসর ধরে শত্রুর চাপে এবং বর্শার মুখে তাদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে অগ্রগতি সাধন করেছে।



## হিজরতের ঘটনা প্রবাহ

### উদ্দেশ্যের পথে জন্মভূমি ত্যাগ

ইসলামের নবী (সা.) মক্কাবাসীদের বিরোধিতা এবং দলবদ্ধ হয়ে বাধা প্রদানকে তাদের কপালের দাগ থেকেই বুঝে নিয়েছিলেন যে, তারা ভ্রান্ত গোঁড়ামী, কুসংস্কার এবং মুর্থতায় নিমজ্জিত। অতি সহজে তারা এ পক্ষিল বিশ্বাস ও অহেতুক কার্যকলাপ থেকে দূরে সরবার নয়। তাদেরকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে ত্যাগ, কঠোর পরিশ্রম এবং ব্যাপক সংগ্রামের প্রয়োজন রয়েছে। রাসূল (সা.) তাঁর দূরদর্শিতার মাধ্যমে এই চড়াই উৎরাই পটভূমিকে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর এ অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে ইসলামের ঝাণ্ডা ও প্রচারকে কাঁধে তুলে নেন এবং ধৈর্য্য ও সহনশীলতাকে তাঁর ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। রাসূল (সা.) ইসলামের বিরোধীদের প্রতিবন্ধকতার সাথে মক্কায় ১৩ বৎসর সংগ্রাম করেন।<sup>১০</sup> কিন্তু ইসলামের শত্রুরা তাদের শয়তানী কার্যাবলী থেকে হাত গুটিয়ে নেয় নি বরং সর্বশক্তি দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়েছে। এ পরিস্থিতিতে মহানবীর বিশ্বজনীন রেসালতের দাবি ছিল এটাই যে, তিনি তার ইসলাম প্রচারের স্থান পরিবর্তন করে কোন এক উপযুক্ত ও শান্তিপূর্ণ স্থানে চলে যান।

### আওস ও খায়রাজ গোত্রের ইসলাম গ্রহণ

খায়রাজ গোত্রের কিছু নেতৃবৃন্দ হজের মৌসুমে মক্কায় এসে মসজিদুল হারামে রাসূল (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। রাসূল (সা.) তাদেরকে শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের দীন, ইসলামে দাওয়াত করেন। তারাও যেহেতু আওস গোত্রের সাথে দীর্ঘদিনের মতপার্থক্যের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল, (রাসূলের এ দাওয়াতের মধ্যে) তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তুকে ফিরে পেল এবং আন্তরিক ভাবে ইসলাম গ্রহণ করল।

খায়রাজরা ফেরার সময় রাসূল (সা.)-এর কাছে একজন মোবাল্লেগ এবং পথ প্রদর্শক চাইল। রাসূল (সা.) মুসআব ইবনে উমাইরকে তাদের সাথে পাঠান এবং এরই মাধ্যমে মদীনা শহর ইসলামের উদিত সূর্যের সাথে পরিচিত হয় এবং নতুন দিনের পর্যালোচনা করতে আগ্রহী হয়ে

ওঠে। কোরআনের আকর্ষণীয় ও নূরানী আয়াত শ্রবণের মাধ্যমে মানুষ ইসলামের দিকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষিত হতো। মুসআব আওস ও খায়রাজ গোত্রের নেতাদের ইসলাম গ্রহণের খবর রাসূল (সা.)- কে পাঠায়। পরবর্তীতে মদীনা থেকে যারা হজ পালন করতে মক্কায় এসেছিল তারা গোপনে রাসূল (সা.)- এর সাথে দেখা করেন। মদীনার মুসলমানরা ইসলামের বৃক্ষকে ফলবান হওয়ার জন্য রাসূল (সা.)- এর সাথে বাইয়াত করেন। তারা শপথ করেন যে, যেভাবে তারা তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের সমর্থন ও প্রতিরক্ষা করে ঠিক তেমনভাবেই রাসূল (সা.) ও ইসলামকে সমর্থন করবে।<sup>৬১</sup>

## মহানবী (সা.)- কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র

পূর্বগগন ফর্সা হওয়ার পূর্বেই কোরাইশরা মদীনাবাসী মুসলমানদের চুক্তি সম্পর্কে অবহিত হয় এবং তা নিষ্ফল করতে ও রাসূল (সা.)- এর অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে উঠে পড়ে লেগে যায়। এ কারণেই তারা দারুন নুদবায় (কোরাইশদের বৈঠক খানা) আলোচনায় বসে। আলোচনা শেষে তারা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে এসে সম্মিলিতভাবে রাসূল (সা.)- এর ঘরে এসে তাঁকে হত্যা করবে। যার মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াতের ভিত্তি বিধ্বস্ত হয়ে যাবে।<sup>৬২</sup> আল্লাহ তায়ালা মহানবী (সা.)- কে দুশমনদের চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত করেন এবং রাত্রেই মক্কা থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন।<sup>৬৩</sup> হযরত মুহাম্মদ (সা.) ওহী প্রাপ্ত হয়ে জন্মভূমি থেকে হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন।

## আলী (আ.)- এর আত্মত্যাগ

রাসূল (সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে হযরত আলী (আ.)- কে ডাকলেন এবং সকল রহস্য খুলে বললেন। জনগণের আমানতসমূহ তাঁকে দিয়ে বললেন : এগুলোকে তাদের মালিকদেরকে বুঝিয়ে দিবে। অতঃপর বললেন : অনিবার্য কারণবশতঃ আমাকে হিজরত করতে হচ্ছে, কিন্তু তোমাকে আমার বিছানায় ঘুমাতে হবে। আলী (আ.) এক বাক্যে রাজী হয়ে গেলেন এবং রাসূলের জীবন রক্ষা করার নিমিত্তে নিশ্চিত মৃত্যুকে স্বাগত জানালেন।<sup>৬৪</sup>

হযরত আলী (আ.)- এর আত্মত্যাগ এতটা নিষ্ঠাপূর্ণ ছিল যে, মহান আল্লাহ কোরআনে তাঁর প্রশংসা করেছেন।<sup>৬৫</sup> (মানুষের মধ্যে অনেকেই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থে আত্ম উৎসর্গ করে থাকেন।

সূরা বাকারা : ২০৭)

## রাসূল (সা.) সাউর গুহায়

রাত্র গভীর হলে দুশমনরা তাদের কুঅভিপ্রায় বাস্তবায়ন করার জন্যে রাসূল (সা.)- এর গৃহের চার পাশ ঘিরে ফেলে। কিন্তু যেহেতু মহান আল্লাহ্ নিজেই রাসূল (সা.)- এর সহায়ক ছিলেন, তাকে এ বিপদ থেকেও রক্ষা করেন। রাসূল (সা.) সূরা ইয়াসীন পাঠ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে ভিন্ন পথে মক্কার বাইরে সাউর গুহায় যান। হযরত আবু বকরও (রা.) জানতে পেরে রাসূল (সা.)- এর সাথে গেল।

কাফেররা উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে রাসূল (সা.)- এর বিছানার দিকে হামলা করে কিন্তু বিস্ময়ের চোখে রাসূল (সা.)- এর বিছানায় হযরত আলীকে দেখতে পেল এবং অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞাসা করল : মুহাম্মদ কোথায় গিয়েছে ? আলী (আ.) জবাব দিলেন : আমি কি তোমাদের পক্ষ থেকে তাঁর পাহারায় নিয়োজিত ছিলাম? তোমরা তাকে শহর থেকে বের করে দিতে চেয়েছিল, তিনিও শহর ছেড়ে চলে গেছেন।<sup>৬৬</sup> কোরাইশরা তাদের সকল চক্রান্ত ভেঙে যেতে দেখে তারা তাঁকে খুঁজে পেতে চতুর ও সূক্ষ্ম এক পরিকল্পনা নিল কিন্তু তাও নিষ্ফল হলো।

## ইয়াসরেব (মদীনা) অভিমুখে যাত্রা

মহানবী (সা.) তিনদিন সাউর গুহায় অবস্থান করার পর ইয়াসরেব অভিমুখে রওনা হন।<sup>৬৭</sup> সোরাকা ইবনে মালেক নামে এক ব্যক্তি মক্কা থেকে মহানবীর পিছু ধাওয়া করে কিন্তু তার ঘোড়ার পা তিন বার মাটিতে পুতে যায় এবং ঘোড়া তাকে ফেলে দেয়। ফলে সে তওবা করে ফিরে আসে।<sup>৬৮</sup>

রাসূল (সা.) ১২ই রবিউল আউয়াল কোবায় পৌঁছান<sup>৬৯</sup> এবং কয়েক দিন সেখানে অবস্থান করেন।<sup>৭০</sup>

হযরত আবু বকর মহানবীকে পীড়াপীড়ি করতে থাকে যে চলুন মদীনায় চলে যাই। কিন্তু রাসূল (সা.) তা গ্রহণ না করে তাকে বললেন :

আলী তাঁর জীবন বাজী রেখে আমাকে রক্ষা করেছে এবং সে আমার আহলে বাইতের সর্বোত্তম ও চাচাত ভাই। আলী এখানে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ব না।<sup>৭১</sup>

রাসূল (সা.) হযরত আলীকে যে দায়িত্ব দিয়ে এসেছিলেন তা তিনি যথার্থভাবে পালন করে স্বীয় মাতা ও রাসূলের কন্যা ফাতেমাকে নিয়ে রাসূলের নিকট পৌঁছেন। কিন্তু বন্ধুর পথে উটের রশি টেনে অতিক্রম করতে তাঁর পা ক্ষত বিক্ষত হয়েছিল। ফলে তিনি অতি কষ্টে হাঁটছিলেন। রাসূল (সা.) স্নেহের সাথে হযরত আলীকে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁর পায়ের ক্ষত স্থানে নিজের মুখের পবিত্র থুতু লাগিয়ে দিলেন। আর এর মাধ্যমে আলী (আ.) সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেন। অতঃপর একত্রে মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন।<sup>৭২</sup>

## ইয়াসরেব (মদীনা) রাসূলের প্রতীক্ষায়

ইয়াসরেব অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল এবং শহরে এক বিশেষ উত্তেজনা বিরাজ করছিল। জনগণ রাসূল (সা.)- এর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিল।

রাসূল (সা.) শুক্রবারে ইয়াসরেবে প্রবেশ করেন। জনগণ মরিয়্যা হয়ে রাসূল (সা.)- এর নূরানী চেহারার দিকে তাকিয়ে ছিল।

রাসূল (সা.) ইয়াসরেবে স্থায়ী হন এবং ন্যায়বিচার ও ঈমানের ভিত্তিতে ইসলামের মহান সংস্কৃতির ভিত্তি রচনা করেন।

রাসূল (সা.)- এর প্রবেশের পর ইয়াসরেবের নাম পরিবর্তন করে ‘মদীনাতুন নাবী’ অর্থাৎ নবী (সা.)- এর শহর নাম করণ করা হয়। এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কারণে অর্থাৎ মিথ্যার উপর সত্যের বিজয় হওয়াতে এ দিনকে ইতিহাসের সূচনা হিসাবে গণ্য করা হয়। জনগণ ইসলামের সূর্য কিরণে যেন এক নতুন জীবন ফিরে পেয়েছিল। আর জাহেলী যুগের জরাজীর্ণ এবং নষ্ট চরিত্র ও বিশ্বাস পরিবর্তন হয়ে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়।

## হিজরতের শিক্ষা

মহান হিজরতের ১৪ শত বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখতে পাব যে মুসলমানরা হিজরত এবং ইসলামের ভিত্তি রচনা করতে কতই না কষ্ট সহ্য করেছিলেন।

মুসলমানরা কুরাইশদের অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে মুক্ত হয়ে শান্তিময় স্থানে এসে নিজেদেরকে গডালিকা প্রবাহে ভাসিয়ে দেন নি। বরং ইসলামী সংস্কৃতি বাস্তবায়ন ও তার সম্প্রসারণের জন্যে দিবা রাত্র পরিশ্রম করেছিলেন।

এ ত্যাগ ও কঠোর পরিশ্রমই তাদেরকে দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্তি দিয়েছিল এবং তাদেরকে কল্যাণ ও মহত্ব দান করেছিল।

এ স্মৃতিকে প্রতি বৎসর হিজরতের বার্ষিকী পালন করে জীবিত রাখতে হবে। যে কষ্ট ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানরা আল্লাহর প্রতি ঈমান ও রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে পবিত্র ইসলামী বিপ্লব অর্জন করেন ও তার উন্নতি সাধন করেন, তাকে আমাদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

আমাদেরকে অবশ্যই এ বিষয়টিকে পরবর্তী প্রজন্মের নিকট পৌঁছে দিতে হবে যে, সে যুগের মুসলমানদের যে সম্মান ও মহত্ব ছিল তা তাদের ঈমান ও প্রচেষ্টার মধ্যেই নিহিত ছিল। আমরা যদি পুনরায় সে মর্যাদা অর্জন করতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।



## মদীনায় ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের গোড়াপত্তন

জীবন্ত সমাজ একমাত্র সমচ্ছিত্তা, আন্তরিকতা, সহমর্মিতা এবং পারস্পরিক সমন্বয়ের এরূপ সমাজেই সকলে তাদের কল্যাণ ও অগ্রগতি অর্জন করতে পারে এবং সমন্বিত ভাবে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে।

ইসলাম এরূপ সমাজ গড়ে তোলার জন্যে গোত্র, ভাষা, গায়ের রং এবং ভৌগোলিক অবস্থানের প্রতি কোন ভ্রক্ষেপই করে নি। বরং সকলকে মুসলমান, সংগতিপূর্ণ এবং সুসংহত মনে করে।<sup>৭৩</sup> ইসলামের একমাত্র দৃষ্টি ছিল আল্লাহর প্রতি ঈমান, যা সকল সংগতি ও সুসংহতির মূল।

‘ইসলামী ভ্রাতৃত্ব’ হলো সর্বোত্তম বাক্য, যা ঐক্য ও সর্বাঙ্গিক সংগতিকে স্পষ্ট করে। পবিত্র কোরআন সুন্দর ও স্পষ্ট ভাষায় বলছে :

(انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم)

অর্থাৎ নিশ্চয় মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে সংশোধন পূর্বক শান্তি স্থাপন কর।<sup>৭৪</sup>

## ইসলামে ভ্রাতৃত্ব বোধ স্থাপনে মহানবী (সা.)- এর বিরল কৃতিত্ব

মহানবী (সা.) মদীনায় প্রবেশ করে সেখানে মসজিদ তৈরী করেন- যা ছিল মুসলমানদের সদর দফতর বা ঘাঁটি নির্মানের পর সর্ব প্রথম যে মৌলিক কাজটি করেন তা হলো ইসলামী ভ্রাতৃত্ব স্থাপন। এর মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে পূর্বের চেয়ে বেশী ঐক্য ও আন্তরিকতার সৃষ্টি হয়। যদিও তারা তাদের জন্মভূমি এবং আত্মীয়- স্বজন হারিয়ে ছিলেন, কিন্তু তার পরিবর্তে তারা এমন ভাই পেয়েছিলেন যারা সার্বিক দিক থেকে অনেক বেশী বিশ্বস্ত এবং সহানুভূতিশীল ছিলেন।

যদিও প্রত্যেক মুসলমানই একে অপরের ভাই, তা সত্ত্বেও রাসূল (সা.) তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ‘আকদে উখুওয়াত’ (ভ্রাতৃত্ব বন্ধন) সৃষ্টি করেন এবং হযরত আলীকে নিজের ভাই হিসাবে গ্রহণ করে বলেন : আলী হচ্ছে আমার ভাই।<sup>৭৫</sup>

ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সম্মানের সাথে স্মরণ করে পবিত্র কোরআন বলছে :

(و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فاللف بين قلوبكم فاصبحتم

بنعمه اخوانا و كنتم علي شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتهدون)

অর্থাৎ ‘এবং তোমরা সকলে সমবেত ভাবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিভক্ত হয়ো না; এবং স্মরণ কর তোমাদের উপর আল্লাহর নেয়ামতকে যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করলেন এবং তোমরা তারই নেয়ামতের ফলে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে এবং তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের কিনারায় ছিলে তখন তিনি তোমাদেরকে তা হতে রক্ষা করলেন। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যেন তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও।’ (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

## ইসলামী ভ্রাতৃত্ব (ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের ধ্বনি)

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব কোন আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এক বাস্তবতা যা ঈমানের সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত এবং তার ফল পর্যায়ক্রমে প্রকাশ লাভ করে।

ইমাম জাফর সাদেক (আ.) ইসলামী ভ্রাতৃত্বের কিছু বৈশিষ্ট্যকে এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন :

মুমিন অপর মুমিনের ভাই এবং পথ প্রদর্শক। সে অপরের প্রতি জুলুম এবং খিয়ানত করে না। তাকে ধোকা দেয় না এবং কখনোই ওয়াদা ভঙ্গ করে না।<sup>৭৬</sup>

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অপর এক অবদান হলো এই যে, প্রত্যেক মুসলমান তার নিজের জন্যে যা চায়, তার ভাইয়ের জন্যে একই প্রত্যাশা করবে। তাঁকে (দীনি ভাইকে) অর্থ সম্পদ, শক্তি ও কথার মাধ্যমে সাহায্য করবে। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব থেকে এটা আশাই করা যায় না যে, এক মুসলমান পেট ভরে খেয়ে, ভাল পোশাক পরে আনন্দে থাকবে, অথচ তার অপর মুসলমান ভাই অনাহারে বস্ত্রহীন ভাবে দিন কাটাবে।

হযরত ইমাম সাদেক (আ.) বলেছেন : যদি তোমার ভৃত্য ও সেবক থাকে অথচ তোমার ভাইয়ের না থাকে তাহলে তোমার ভৃত্যকে ঐ ভাইয়ের কাজে সাহায্যের জন্যে পাঠাও।<sup>৭৭</sup>

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব সকল সম্পর্ক এমনকি আত্মীয়তার সম্পর্ককেও নিয়ম নীতির আওতাভুক্ত করেছে। কোরআন স্পষ্ট ভাষায় বলছে :

“তুমি এমন কোন কওম পাবে না যারা আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান রাখে, (অপরদিকে) তারা তাদেরকেও ভালবাসে যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করেছে, যদিও তারা তাদের পিতৃপুরুষ অথবা তাদের সন্তান- সন্ততি অথবা তাদের ভ্রাতৃবৃন্দ অথবা তাদের গোত্র গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হউক না কেন।”

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব সালমান ফার্সী এবং বেলাল হাবাশীকে মহানবী (সা.)- এর নিকটতম অনুসারীর অন্তর্ভুক্ত করেছে। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ছায়ায় চরম শত্রুতারও অবসান ঘটে। ছত্রভঙ্গ জনতা একে

অপরের বন্ধুতে পরিণত হয়। এই ঐক্য এবং সংহতির কারণেই প্রত্যেক মুসলমানই এক বৃহৎ পবিরারের ন্যায় একে অপরের সুখ-দুঃখের অংশীদার।

দয়ালু এবং পুণ্ডরিকের অধিকারী জনগণের শ্লোগান হলো ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্ব।

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রত্যেক মুসলমানের উপর এক দায়িত্ব সৃষ্টি করে। যার জন্যে কোন মুসলমানই নিজেকে অন্যের সমস্যা ও বিপদ থেকে পৃথক করে দেখতে পারে না। বরং সকলেই তাদের সামর্থ অনুযায়ী মুসলমানদের সমস্যা সমাধান করতে সদা সচেষ্ট।

এ দায়িত্ব দু'ভাগে বিভক্ত :

### প্রথম ভাগ

#### অর্থনৈতিক সহযোগিতা

অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সহযোগিতা করা যেমন : সুস্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা বিধান, সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা, বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং কর্মসংস্থান ইত্যাদি। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন এবং মহান ইমামগণের বাণীতেও কিছু সংখ্যক মৌল কর্মসূচী উপস্থাপিত হয়েছে যেমন : যাকাত, খুমস, সদকা, দান ইত্যাদি।

### দ্বিতীয় ভাগ

#### জ্ঞানগত এবং প্রশিক্ষণগত সহযোগিতা

দীনি প্রচার, তাবলিগ, পথ নির্দেশনা এবং উপদেশ দান করা, যে যতটুকু জানে অন্যদেরকে তা জানানো সকলের উপর একান্ত জরুরী। অন্যদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য করা চলবে না। ন্যায় কাজে আদেশ ও অন্যায় কাজে নিষেধ করতে হবে। যা প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার হিত সাধন এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এক প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু মুসলমানরা যদি কল্পনাপ্রসূত ভয়ের কারণে এবং অবাস্তব স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে এই মহান সুন্নাতকে পরিত্যাগ করে এবং গুনাহ থেকে নিষেধ না করে ও সৎ কাজে অনুপ্রেরণা না যোগায়, তাহলে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রশিক্ষণের প্রাণ নিঃশেষিত হবে। আর এ ভাবে একটি সচেতন সমাজের সকল ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য বিদায় নিবে।

## বর্তমান যুগে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব

বর্তমান যুগের মুসলমানদের জন্য ঐক্য ও সংহতির প্রয়োজনীয়তা সর্ব যুগের চেয়ে বেশি। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা ইসলামী দেশসমূহে অনেক মূল্যবান খনিজ ও অন্যান্য সম্পদ দান করেছেন, যার প্রতি অন্যদের দৃষ্টি পড়েছে এবং এ কারণে তারা মুসলমানদেরকে পরস্পর থেকে পৃথক করতে চায়।

আমাদেরকে অবশ্যই সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের স্থিতি যার ভিত্তি মহানবীর পবিত্র এবং শক্তিশালী হাতে স্থাপিত হয়েছে তা সহ ইসলামের সকল নিয়মের অনুসরণ করতে হবে।

মুসলমানরা যতই শক্তিশালী হোক না কেন তাদের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অতএব, ইসলামী ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের কর্মসূচী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের ছাত্র- ছাত্রীদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। ফলে উচ্চ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও জ্ঞানগত শিক্ষার মাধ্যমে তা মজবুত হবে। তাছাড়া প্রত্যেক পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো সন্তানদেরকে মুসলামান ভাই ভাই এবং একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হিসাবে গড়ে তোলা।

## ইসলামে জিহাদ

রহমতের নবী (সা.)

একশো কোটির অধিক সংখ্যক মুসলমান বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে রাসূল (সা.)- এর নবুওয়াতের ১৪শ বৎসর পূর্তি (পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রবেশ) উপলক্ষে উৎসব পালন করেন।

এ উৎসব সেই মহতী দিনের কারণে উদযাপিত হচ্ছে যে দিন রাসূল (সা.) শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের ঝান্ডাকে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। আর (وما ارسلناك الا رحمة للعالمين) শ্লোগান দিয়ে বিশ্ব শান্তির

ভিত্তি এবং সম্ভবত্ব ভাবে শান্তির সাথে বসবাসের নিশ্চয়তা বিধান করেন।<sup>৭৮</sup>

ইসলাম শ্রেণী এবং গোত্র এবং জাতিগত বৈষম্য যা অধিকাংশ যুদ্ধ ও অঘটনের কারণ, তাকে উত্তম উপায়ে সমাধান করেছে। কিন্তু আধুনিক বিশ্ব এখন পর্যন্ত তার শিকার এবং প্রত্যহ যে কোন বাহানায় যুদ্ধ করছে।

ইসলামের শান্তিপ্ৰিয়তা ও ন্যায়পয়ায়ণতা এতই বেশী যে আহলে কিতাবদেরকে (ইহুদী ও খ্রিস্টান) ঐক্য ও সংহতির দিকে উদার আহ্বান জানিয়ে বলছে :

“তুমি বল, হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক কথায় আস যা আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে সমান, (আর তা হলো) আমরা যেন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করি।” (আলে ইমরান : ৬৪)

মুসলমানরা যখন মদীনায় হিজরত করলেন এবং ইসলামের বিজয় পতাকা তাদের মাথার উপর শোভা পাচ্ছিল তখন বিরোধীরা মহানবী (সা.)- এর নিকট সন্ধি পত্র নিয়ে উপস্থিত হলো এবং মহানবী (সা.)ও তাদেরকে স্বাগত জানালেন। এ সন্ধির সাক্ষী স্বরূপ হিজরতের প্রথম বর্ষে ইহুদীদের সাথে যে সকল সন্ধি হয়েছিল তা উল্লেখ করা যেতে পারে।<sup>৭৯</sup>

ইসলাম শান্তি ও একত্রে বসবাসে আগ্রহী এবং এ ক্ষেত্রে বহু ফলপ্রসূ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

## কিসের জন্যে জিহাদ?

ইসলাম জীবন্ত ও বিশ্বজনীন দীন, যা পৃথিবীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ করেছে।

ইসলাম সাবেক রোমীয় ধর্ম, ইহুদী এবং নাজীদের মত সমাজ এবং গোত্রের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের জন্যে। মুসলমানরা ইসলামের শিক্ষার অনুসারী হিসাবে তাদের দায়িত্ব হলো, বঞ্চিত ও নিপীড়িত জনগণের মুক্তি দানে এবং শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় বিশ্বের জনগণকে জীবনের কর্মসূচী সম্পর্কে অবহিত করতে সচেষ্ট হওয়া।

ইসলামের মুজাহিদরা চিলতে পরিমাণ জমি হস্তগত করার জন্যে জিহাদ করেনি। আর এ জন্যেও জিহাদ করেনি যে এক সরকারকে বদলে ঐ স্থানে ঐ রূপ এক সরকার অথবা তার চেয়ে আরো বেশী অত্যাচারী সরকার প্রতিষ্ঠা করবে। বরং জিহাদ হলো একটি মানবপ্রেম মুখী প্রচেষ্টা যা আল্লাহর রাহে এবং মানুষের কল্যাণের জন্যে ও অসংখ্য দুর্বল মানুষকে মুক্তি দিতে সংঘটিত হয়ে থাকে যেন ফেৎনা দূরীভূত হয় এবং সর্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই মহৎ উদ্দেশ্য এবং এ জীবন্ত শিক্ষা ব্যাপক সংখ্যক জনগণের অসচেতনতার ইতি টানবে। তাছাড়া কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী ও সুবিধাবাদী যারা অনাথদের কলিজার রক্ত চুষে স্বপ্নের জীবন গড়ে তাদের পথ বন্ধ করে দেয়।

মানুষের ফিতরাতের (সহজাত প্রবণতা ও বিবেকের) দাবী হলো আগাছা এবং সমাজের নষ্ট অংশ সমূহ কেটে ফেলতে হবে। তাহলে জনগণের মুক্তির ও কল্যাণের পথ সুগম হবে। মানব প্রেমিক, ন্যায় পরায়ণ এবং স্বাধীনচেতা মানুষেরা এরূপ সংগ্রামের প্রতি উদ্যোগী ও তার প্রশংসা করেন।

মহান আল্লাহ্ কতইনা অপূর্ব ভাষায় বলেছেন :

“এবং আল্লাহ্ যদি মানব জাতিকে, তাদের একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে অবশ্যই পৃথিবী ফ্যাসাদপূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ্ সকল জগদ্বাসীর উপর অতীব অনুগ্রহশীল।” (সূরা বাকারা : ২৫১)

ইসলামী আইনে জিহাদ প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে গৃহীত হয়নি। বরং তা সীমালংঘন ও নির্যাতন রোধের জন্যে। তাছাড়া যোগ্য মানুষদের কল্যাণের পথ সুগম করতে জিহাদকে সর্বশেষ উপায় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আরব মুসলমানদের প্রতিনিধি ইরানের সেনাপতি রুস্তম ফারাখযাদকে বলেছিলেন :

“আল্লাহ্ আমাদেরকে নির্বাচন করেছেন এই জন্যে যে, জনগণকে বান্দা পূজারী থেকে খোদা পূজারীতে, বিশ্বের বন্দিত্ব থেকে স্বাধীন ও সৌভাগ্যবান করতে এবং ভ্রান্ত দীন সমূহের অত্যাচার থেকে ন্যায় ভিত্তিক ইসলামের পথে দাওয়াত করার জন্যে। যারা আমাদের দাওয়াত গ্রহণ করবে তার দেশকে তার কাছে সপে দিয়ে চলে যাব...”<sup>৮০</sup>



## ইসলামের অগ্রগতি কি তববারীর সাহায্যে হয়েছে?!

মুসলমানদের জিহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এটা যে, নিজেদের ও আপামর বঞ্চিতদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। এর মাধ্যমে তারা ইসলামের কানুন সম্পর্কে জানতে পারবে এবং ইসলামের মহত্ত্ব ও সত্যতাকে নিকট থেকে দেখবে।

মুসলমানরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধের সময় কখনোই কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করত না। তারা সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে নিজেদের দীনে অটল থাকতে পারত। এর পরিবর্তে ইসলামী রাষ্ট্র তাদেরকে সাহায্য করত।

রাসূল (সা.) হুদাইবিয়ার সন্ধিতে অঙ্গিকার করেন যে, যদি মক্কার কোন ব্যক্তি মুসলমান হয় এবং মদীনায় মুসলমানদের নিকট চলে আসে, মুসলমানরা তাকে গ্রহণ না করে মক্কায় পাঠিয়ে দিবে।<sup>৮১</sup> এবং তিনি সে ওয়াদা অনুযায়ী আমল করেন।<sup>৮২</sup> যদিও পারতেন কাফেরদের কাছ থেকে অঙ্গিকার নিতে যে, যদি কোন মুসলমান ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে মক্কায় কাফেরদের নিকট যায় তাহলে তাকে মদীনায় ফিরিয়ে দিতে।

রাসূল (সা.) মক্কা বিজয়ের দিনে কুরাইশদেরকে স্বাধীন ভাবে ছেড়ে দেন এবং কাউকেই ইসলাম গ্রহণের জন্যে বাধ্য করেন নি। বরং ছেড়ে দিয়েছিলেন যেন তারা নিজেরাই সঠিক দীনকে চিনে নেয়। তাছাড়া রাসূল (সা.) মুসলমানদেরকে বলে রেখে ছিলেন যে, মক্কার দু এক জন অপরাধী ব্যতীত কাউকেই যেন হত্যা না করা হয়।<sup>৮৩</sup> অনুরূপ যখনই কোন কাফের নিরাপত্তা চাইত, তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হতো। যেন সে গবেষণার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে। যেমন : সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা মক্কা বিজয়ের পর জেদ্দায় পালিয়ে যায়। যখন রাসূল (সা.)- এর কাছে তার জন্যে নিরাপত্তা চাইল, রাসূল (সা.) নিজের আমামা তার জন্যে পাঠিয়ে দেন, যেন এটার মাধ্যমে সে নিরাপদে থাকতে পারে এবং মক্কায় প্রবেশ করতে পারে। সাফওয়ান জেদ্দা থেকে ফিরে এসে রাসূল (সা.)- এর কাছে দুই মাস সময় চায়। রাসূল (সা.) গ্রহণ করেন এবং তাকে চার মাস সময় দেন। সে কাফের থাকা অবস্থায় রাসূল (সা.)- এর সাথে

হুনাইন এবং তায়েফ যায় ও অবশেষে স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়।<sup>৮৪</sup> এভাবে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তলোয়ারের ব্যবহার শুধুমাত্র তাদের জন্যেই, যারা সত্যকে চেনা সত্ত্বেও তার বিরোধিতা করে এবং অন্যদের কল্যাণ ও সৌভাগ্যের পথে বাধা দান করে।

তরবারি ফেৎনাসমূহ দূরীভূত করার জন্যে বঞ্চিতদের মুক্তির জন্যে এবং মানুষের উন্নতি ও পরিপূর্ণতার জন্যে উপযুক্ত ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানদের ঈমান ও দৃঢ়তাই উত্তম দলিল যে, তরবারির মাধ্যমে ইসলামের অগ্রগতি সাধিত হয়নি। প্রথম যুগের মুসলমানরা দীনকে এত বেশি ভালবাসত যে, সকল সমস্যার বিপরীতে অবিচল থাকতেন; এমনকি নিজের জন্মভূমি ছেড়ে হিজরত করতেন।

বেলাল হাবাশী ইসলামের প্রথম দিকের মুসলমানদের মধ্যে একজন ছিলেন। আবু জেহেল তাকে হেজাজের গরম বালিতে ফেলে রেখে বুকুর উপর পাথর চাপা দিয়ে রাখত এবং রৌদ্রের তাপে গরম হলে যখন সে যন্ত্রণায় চিৎকার করত তাকে বলা হতো : মুহাম্মদের খোদাকে অস্বীকার কর, কিন্তু বেলাল অনবরত বলত : আহাদ, আহাদ।<sup>৮৫</sup> এত সকল অত্যাচার সহ্য করেও সে ইসলাম থেকে হাত গুটিয়ে নেয়নি বরং দীন ইসলামের প্রতি অটল থেকেছে।

এ অবস্থার পরও কি বলা যায় যে, ইসলামের অগ্রগতি তরবারির জোরে হয়েছে?!

ইসলামের শত্রুরা যেহেতু ইসলামের কোন দুর্বল দিক খুঁজে পাচ্ছিল না; তাই চেয়েছিল এভাবে ইসলামকে কলঙ্কিত করতে। কিন্তু তারা জানে না যে ইসলাম তার সহজ সরল নীতি এবং বঞ্চিত ও নিপীড়িত জনগণকে সাহায্য করার মাধ্যমে অগ্রগতি সাধন করবে।

ফরাসী ঐতিহাসিক ড. গুস্তাভলুবুন লিখেছেন : ইসলামী বিশ্বের সম্প্রসারণ যুদ্ধের মাধ্যমে যতটা না হয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশী হয়েছে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যমে।<sup>৮৬</sup>

## রাসূল (সা.)- এর সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধ

### পারস্পরিক সমঝোতার আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের রাসূল (সা.) বিশ্বের স্বৈরাচারী শাসকদের ন্যায় সীমানা বৃদ্ধি করতে বা জনগণের উপর শোষণ চালাতে কিংবা বিভিন্ন জাতির ধনসম্পদ হস্তগত করতে যুদ্ধ করেন নি। বরং কোরআন ও ইসলামী আইনের মশাল নিয়ে এগিয়ে যেতেন। তরবারিকে শুধুমাত্র জরুরী ক্ষেত্রে যেমন : অত্যাচার ও জুলুম ঠেকাতে এবং সত্য ও ন্যায়ের বাণ্ডাকে উন্নীত করতে অথবা সত্য প্রচারের পথের বাধা দূর করতে ব্যবহার করতেন।

রাসূল (সা.)- এর সময়ে যে সকল যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তা ছিল স্বার্থপর ও জালিম লোকদেরকে উৎখাত করতে। কেননা তারা আল্লাহর পবিত্র বান্দাদের উপর জুলুম করত এবং সত্য ও ইসলামের আকিদা প্রচারের পথে বাধা সৃষ্টি করত। এছাড়া যেন মানুষ ইনসাফ ও ন্যায় সংগত হুকুমতের ছায়ায় আন্তর্জাতিক পারস্পরিক সমঝোতার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, সে উদ্দেশ্যেই ঐসকল যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

এরূপ যুদ্ধকে কি অবৈধ বলা যেতে পারে?! অবশ্য প্রত্যেক নবীর জন্যেই এ সংগ্রাম একান্তভাবে জরুরী এবং প্রতিটি বিবেকবান ব্যক্তিই এর প্রশংসা করবে। কেননা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে এটা ছাড়া আর অন্য কোন পথ খোলা থাকে না।

যেহেতু হযরত ঈসা (আ.)- এর নবুওয়াকাল কম ছিল এবং উপযুক্ত পরিবেশ ছিলনা, তাই তিনি যুদ্ধ করেন নি। অন্যথায় তিনিও সমাজের আগাছাগুলোকে উৎখাত করতেন। ‘খ্রিস্টানদের ধর্মপ্রচারমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহ’ ইসলামী বিশ্বের মনোবলকে দুর্বল করার জন্যে এবং উপনিবেশ ও অনাচারের সাথে সংগ্রামের মানসিকতা নিস্পাণ করতে এবং ইসলামের উত্তরোত্তর অগ্রগতিতে বাধা দেয়ার জন্যে রাসূল (সা.)- এর যুদ্ধ সমূহকে উল্টোভাবে ব্যাখ্যা করে। আর হতাহতের সংখ্যাকে লোমহর্ষক ভাবে উপস্থাপন করে। এর মাধ্যমে তারা মধ্যযুগে খ্রিস্টান ধর্মযাজকগণ কর্তৃক ধর্মদ্রোহী আখ্যা দিয়ে সাধারণ মানুষ ও বিজ্ঞানীদের ব্যাপক হত্যাসহ মুসলমানদের সাথে

সংঘটিত ক্রুসেডের যুদ্ধকে (যাতে মিলিয়ন মিলিয়ন নিরাপরাধ লোককে হত্যা করা হয়) সামান্য এবং সাধারণ বলে উপস্থাপন করতে চায়।

প্রথমে আমরা মহানবী (সা.)- এর প্রসিদ্ধ যুদ্ধ সমূহের উদ্দেশ্য এবং শেষে মৃতের সংখ্যা তুলে ধরব। যার মাধ্যমে সত্য সুস্পষ্ট হবে এবং পাঠকবৃন্দ মহানবী (সা.)- এর এর যুদ্ধ সমূহের দর্শন উপলব্ধি করতে পারবেন। তাছাড়া জানতে পারবেন যে কত নগণ্য সংখ্যক মানুষ এ সকল যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিল।

**১: বদরের যুদ্ধ.** মহানবী (সা.) ও তাঁর সাথীরা তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর হতে ১৩ বৎসর যাবৎ মক্কায় কুরাইশদের হাতে নির্যাতিত হন। অবশেষে রাসূল (সা.) ও তাঁর সাথীরা জন্মভূমি ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেন। কিন্তু মক্কার কাফেররা তাদের অত্যাচার অব্যাহত রেখেছিল এবং অসহায় মুসলমানদেরকে নির্যাতন করত। তারা তাদেরকে মক্কা থেকে হিজরত করার ও অনুমতি দিত না।<sup>৮৭</sup>

অন্যদিকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, মদীনায় এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করবে। নির্দেশ দেয় যে, কোন কাফেলাই যেন মদীনায় কোন খাদ্য- সামগ্রী না নিয়ে যায়। বেশ কিছু দিন এ অবরোধ চলার পর মদীনার লোকজন বেশ কষ্টে ও বিপদে পড়ে। খাদ্য সামগ্রী আনার জন্যে তাদেরকে বাধ্যতামূলক ভাবে লোহিত সাগর উপকূলে যেতে হত।<sup>৮৮</sup>

আবু জেহেল ও রাসূল (সা.)- এর হিজরতের পর রুঢ় ভাষায় এক পত্র লেখে এবং রাসূল (সা.)- কে সাবধান করে দেয় যে কুরাইশদের হামলার প্রতীক্ষায় থাকতে।<sup>৮৯</sup>

এ পর্যায়ে আল্লাহ বললেন : ‘যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে (আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার) অনুমতি দেওয়া হইল। কারণ তাদের উপর জুলুম করা হচ্ছে এবং নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। (সূরা হজ : ৩৯)

যাদেরকে তাদের ঘর বাড়ী হতে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে বহিস্কার করা হয়েছে যে, তারা বলে : আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক। আল্লাহ যদি এই সকল মানুষের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তা হইলে সাধু- সন্ন্যাসীগণের মঠ, গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং

মসজিদসমূহ যাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয় সেগুলো অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যেত এবং নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা তাঁর সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় শক্তিমান, মহা পরাক্রমশালী। (সূরা হজ : ৪০)

রাসূল (সা.) দ্বিতীয় হিজরীতে ইসলাম রক্ষার্থে ও মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার আদায় করতে এবং কুরাইশদের মারাত্মক নীল নকশা পণ্ড করতে উঠে দাঁড়ান। অবশেষে বদরে কুরাইশদের মুখোমুখী হন। মুসলমান মুজাহিদদের সংখ্যা কুরাইশদের এক-তৃতীয়াংশ ভাগ হলেও ঈমানের শক্তিতে এবং আল্লাহর সাহায্যে তারা কুরাইশদেরকে পরাজিত করেন।<sup>১০</sup>

২: ওহুদের যুদ্ধ. যেহেতু বদরের যুদ্ধে কিছু সংখ্যক কাফের নিহত হয়েছিল, তাই কুরাইশ বিশেষ ভাবে রণ সাজে সজ্জিত হয়ে প্রতিশোধ নিতে তৃতীয় হিজরীতে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হয় এবং ওহুদে মুসলমানদের মুখোমুখী হয়। এ যুদ্ধে কিছু সংখ্যক মুসলমান কর্তৃক রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ অমান্য করা হলে, মুসলমানরা পরাজিত হয়।<sup>১১</sup>

৩: খন্দকের যুদ্ধ. পঞ্চম হিজরীতে বনী নাযির গোত্রের কিছু সংখ্যক ইহুদী মক্কায় যেয়ে কুরাইশদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। কুরাইশ এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং বিভিন্ন গোত্র থেকে লোক নিয়ে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করে।

মুসলমানরা মদীনা শহরের চারপাশে পরিখা খনন করলেন এবং ১০ হাজার শত্রু সৈন্যের বিপক্ষে সারিবদ্ধ হলেন।

হযরত আলী (আ.) বীরদর্পে শত্রুদলের সেনাপতিকে ধরাশায়ী করেন এবং মুসলমানরা বিজয়ী হয়।<sup>১২</sup>

৪: বনি কুরাইযার যুদ্ধ. বনি কুরাইযা<sup>১৩</sup> রাসূল (সা.)-এর সাথে সন্ধি চুক্তি করেছিল কিন্তু খন্দকের যুদ্ধে সে চুক্তি ভঙ্গ করে কুরাইশদেরকে সাহায্য করেছিল।<sup>১৪</sup> যেহেতু রাসূল (সা.) তাদেরকে ভয়ানক হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন তাই তাদেরকে উৎখাত করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিলনা। খন্দকের যুদ্ধের পর রাসূল (সা.) মুসলমানদেরকে বনী কুরাইযাদের দিকে যাত্রা করতে আদেশ দিলেন। ২৫ দিন মুসলমানরা তাদেরকে অবরোধ করে রাখে অবশেষে তারা আত্মসমর্পণ করতে

বাধ্য হয়। আওস গোত্র রাসূল (সা.)-এর কাছে অনুরোধ করল তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে। রাসূল (সা.) বললেন : তোমারা কি রাজি আছ সা'দ ইবনে মায়ায যে হুকুম করে তা মেনে নিতে? সকলেই মেনে নিল, তারা মনে করেছিল যে সা'দ তাদের পক্ষপাতিত্ব করবে। কিন্তু সে পুরুষদেরকে হত্যা, সম্পদসমূহকে বন্টন এবং নারীদেরকে বন্দী করার নির্দেশ দেয়। রাসূল (সা.) বললেন : এদের ব্যাপারে সা'দ যে হুকুম করেছে তা আল্লাহরই হুকুম। এ নির্দেশ অনুসারে তাদের সকল যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হয়।<sup>৯৫</sup>

৫: বনি মুসতালিকের যুদ্ধ. বনি মুসতালিক খাযায়া গোত্রের একটি দল ছিল, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিছু ষড়যন্ত্র এঁটেছিল। রাসূল (সা.) তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত হয়ে সৈন্য নিয়ে তাদের দিকে যাত্রা করেন, যেন তাদের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকেন। মুরাইসী নামক স্থানে তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং বিজয়ী হন। এ যুদ্ধ ৬ষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল।

৬: খায়বরের যুদ্ধ. খায়বরের দুর্গসমূহে ইহুদীদের অনেকগুলো দল একত্রে বসবাস করত। মুশরিকদের সাথে তাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল। যেহেতু তাদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল; তাই ৭ম হিজরীতে মুসলমানরা শত্রুদের প্রাণকেন্দ্র খায়বার অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। অবরোধ এবং যুদ্ধের পর অবশেষে ইহুদীরা ইসলামী হুকুমতের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। (এ যুদ্ধে আলী (আ.)-এর ঢাল ভেঙ্গে গেলে তিনি খায়বার দুর্গের দরজা ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেন এবং যুদ্ধ শেষে তা ছুড়ে ফেলে দেন। ঐ দরজা এত বড় এবং ভারী ছিল যে, পরবর্তীতে ৪০ জনেরও বেশী সংখ্যক লোক তা তুলতে ব্যর্থ হয়)।

৭: মুতার যুদ্ধ. অষ্টম হিজরীতে রাসূলে আকরাম (সা.) হারেছ ইবনে উমাইরকে একটি পত্র দিয়ে বসরার<sup>৯৬</sup> বাদশার নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু রাসূল (সা.) দূত সেখানে পৌঁছলেই তারা তাকে হত্যা করে। মুসলমানরা মহানবীর নির্দেশে শত্রুর দিকে যাত্রা করে। অবশেষে মুতায় রোমের বাদশা হিরাকিলাসের এক লক্ষ সৈন্যের মুখোমুখি হয় এবং তাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধে যাইদ ইবনে হারেছ, জাফর ইবনে আবু তালিব এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা যারা

ইসলামের সেনাপতি ছিলেন শহীদ হন। শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অপারগ হয়ে পড়ে এবং মদীনায় ফিরে আসে।

**৮মক্কা বিজয় :** কুরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তিতে মহানবী (সা.)-এর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, মুসলমান ও তাদের সাথে যারা চুক্তি বন্ধ তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু তারা এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং বনি বাকর গোত্রকে খায়যা গোত্র (যারা মুসলমানদের সাথে চুক্তি বন্ধ ছিল) তাদেরকে ধ্বংস করতে সাহায্য করে।

রাসূল (সা.) তাদের অনুপ্রবেশ প্রতিহত করতে রুখে দাঁড়ান। অতঃপর মক্কায় প্রবেশ করেন এবং মক্কা বিজয় হয়। তিনি খোদার ঘর যিয়ারত করেন। অতঃপর তার ঐতিহাসিক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন : “জেনে রাখ, তোমরা রাসূল (সা.)-এর জন্যে অতি নিকৃষ্ট প্রতিবেশী ছিলে, তাকে অঙ্গীকার করেছিলে এবং তার প্রতি অত্যাচার করেছিলে। আমাদেরকে জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত করেছিলে এমনকি তাতেও তুষ্ট থাকনি। মদীনাতে এবং অন্যান্য স্থানেও আমাদের বিরোধিতা করেছিলে। যেখানে যেতে চলে যাও তোমরা সকলেই স্বাধীন।”<sup>৯৭</sup>

এই ক্ষমা এবং মহত্ত্বের কারণে মক্কার লোকেরা মুসলমান হয়ে যায়। এ বিজয়ে রাসূল (সা.) মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেন। তবে আত্মরক্ষা এবং মুশরিকদের হামলা প্রতিহত করতে অনুমতি দেন। আর ৮ জন পুরুষ ও ৪ জন নারীকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে মাত্র ৪ জনকে হত্যা করা হয়েছিল। খালিদ ইবনে ওয়ালিদের সেনাদল এবং মুশরিকদের মধ্যে কিছুটা দাঙ্গা দেখা দেয় এবং তাতেও কয়েক ব্যক্তি নিহত হয়।

**৯: হুদাইন ও তায়েফের যুদ্ধ.** হাওয়াযেন গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে সৈন্য গঠন করে। রাসূল (সা.) বিষয়টি জানতে পেরে ১২ হাজারের এক বাহিনী নিয়ে তাদের দিকে যাত্রা করেন এবং হুদাইনে যুদ্ধ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত কাফেররা হেরে যায় এবং আত্মসমর্পন করে। এ যুদ্ধের পর রাসূল (সা.) তায়েফের দিকে দৃষ্টি দেন এবং ছাকিফ গোত্রকে (যারা হাওয়াযেন গোত্রের সাথে এক হয়েছিল) উৎখাত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কিছু দিন তাদেরকে অবরোধ করে রাখার পর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন এবং মক্কায় ফিরে আসেন।

এ যুদ্ধসমূহ ব্যতীত রাসূল (সা.)- এর সময়ে কয়েকটি সফর এবং ছোট খাট যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এখন প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সা.)- এর সময়ে সংঘটিত সকল যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা নির্ভরযোগ্য দলিলের মাধ্যমে নিম্নে তুলে ধরা হলো :

## ব্যাখ্যা

১. এই সংখ্যা উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে মত পার্থক্যের স্থানে সর্বোচ্চ সংখ্যাকে ধরা হয়েছে। যেখানে সংখ্যা জানা যায়নি সে ঘরটি খালি রাখা হয়েছে।

২. তারিখে খামিস যা আমাদের একটি তথ্যসূত্র তা একাধিক তাফসীর, হাদীস ও ইতিহাস বইয়ের সমন্বয়।

৩. বিঃদ্রঃ তারিখে খামিসকে সংক্ষেপে ‘তাঃ খাঃ’, সীরাতে ইবনে হিশামকে ‘সীঃ হিঃ’, তারিখে ইয়াকুবীকে ‘তাঃ ইঃ’ তাবাকাতকে ‘তাবাঃ’ বিহারুল আনোয়ারকে ‘বিঃ আঃ’ এবং তারিখে তাবারীকে ‘তাঃ তাঃ’ আকারে লেখা হয়েছে।

যে সামান্য সংখ্যক হতাহতের সংখ্যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তা কখনোই খ্রিস্টানদের বিভিন্ন ধর্মীয় দলগুলোর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ ও ক্রুসেডের যুদ্ধে মৃতের সংখ্যার তুলনায় খুবই নগণ্য।

পাঠক মহাদয় লক্ষ্য করেছেন যে, রাসূল (সা.)- এর কোন যুদ্ধই সীমানা বৃদ্ধি, প্রতিশোধ বা অনুপ্রবেশের উদ্দেশ্যে ছিলনা। বরং অনুপ্রবেশ রোধ, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতা রক্ষার্থে, মুসলমানদের সীমানা প্রতিরক্ষা ও সত্য প্রতিষ্ঠা করতে তা সংঘটিত হয়েছিল।

ড. গুস্তাভলুবুন, মিশুড থেকে বর্ণনা করেন :

“ইসলাম জিহাদকে ওয়াজিব করেছে কিন্তু জনগণকে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের প্রতি ইনসাফ, ন্যায় বিচার ও সদয় আচরণের দাওয়াত দিয়েছে এবং সকল ধর্মকে স্বাধীনতা দিয়েছে।”



## হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর বিশ্বজনীন রেসালত

### ইসলাম পূর্ব ও পশ্চিমের (অর্থাৎ সর্বজনীন) দীন

ইসলাম প্রথম দিন থেকেই স্বচ্ছ ঝর্ণার ন্যায় প্রকাশ লাভ করে। অতঃপর ধীরে ধীরে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এক বিশাল সমুদ্রে পরিণত হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পানি সিঞ্জন করে ও জনগণকে পরিতৃপ্ত করে। এখনো যতই এগিয়ে যাচ্ছে ততই গভীর হচ্ছে ও বিস্তৃতি লাভ করছে। সত্যিই (এ দীন) সকল ভ্রান্ত রীতিসমূহকে ধুয়ে জনগণকে সর্বদা এবং সকল ক্ষেত্রে হেদায়েত ও পথ প্রদর্শন করতে সক্ষম।

ইসলাম স্বৈরাচারী রাজনীতির সকল বাধা উপেক্ষা করে অগ্রগতি সাধন করে চলছে। শত্রুরা ইসলামের ভিত্তি নষ্ট করবার জন্যে ইসলামকে মিথ্যা ভাবে উপস্থাপন করেও কোন ফায়দা লুটতে পারেনি।

ইসলাম বিজয়ের রহস্যকে নিজের হাতে রেখেছে এবং সেই মোতাবেক নিজের আইন ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে।

সে মহান রহস্য ও সূত্রটি হলো এই যে, ইসলাম মানুষের প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রাখে এবং তাদের জীবনধারণের মূল ভিত্তি তারই উপর প্রতিষ্ঠিত।

অতএব, যারা বলে : পূর্ব, পূর্বই এবং পশ্চিম, পশ্চিমই। পূর্বের রাসূল (সা.) পশ্চিমাদের নেতৃত্ব দিতে অক্ষম। তারা ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত। কেননা পূর্ব ও স্বভাবগত দিনের প্রয়োজন বোধ করে, পশ্চিমারাও একই ভাবে তা অনুভব করে। রাসূল (সা.) মক্কা থেকে সারা বিশ্বের জনগণকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেন।

সেদিন রাসূল (সা.)- এর মাধ্যমে মক্কার অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে তৌহীদের ধ্বনি বেজে উঠেছিল। এই আন্দোলনের ঝাণ্ডা বাহকের দৃষ্টি কেবল মাত্র হেজাজ ও আরবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তার দায়িত্ব এটা ছিল যে, তাঁর বিশ্বজনীন রেসালতকে আরব থেকে শুরু করবেন।

এর দৃষ্টান্ত হলো সেই বাক্য যা রাসূল (সা.) তাঁর দাওয়াতের শুরুতেই তাঁর আত্মীয়দের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন :

ابن رسول الله اليكم خاصة والي الناس عامة

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ করে তোমাদের জন্যে এবং সর্বসাধারণের জন্যে প্রেরিত হয়েছি।<sup>৯৮</sup>

কোরআনের আয়াতও এ বিষয়টিকে স্বীকার করে বলছে :

১. (قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا) “ বল, হে মানুষ ! আমি তোমাদিগের সকলের জন্যে আল্লাহর রাসূল।”<sup>৯৯</sup>

২. (وما ارسلناك الا رحمة للعالمين) “আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমত রূপেই প্রেরণ করিয়াছি।”<sup>১০০</sup>

৩. (و اوحى الي هذا القران لا نذكركم به ومن بلغ) ... “এই কোরআন আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে যেন তোমাদেরকে এবং যার নিকট এটি পৌঁছবে তাদেরকে...”<sup>১০১</sup>

উপরোক্ত আয়াত সমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সা.)- এর বিশ্বব্যাপী রেসালত মদীনায়ে হিজরতের পর এবং ইসলামের প্রসারের পর হয়নি। বরং প্রথম দিনেই তিনি সর্ব সাধারণের জন্যে দাওয়াত শুরু করেন।

আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে কোন নির্দিষ্ট সময় বা কোন বিশেষ গোত্রের জন্যে প্রেরণ করেন নি। একারণেই কিয়ামত পর্যন্ত তা সকল সময়ের জন্যে নতুন ও প্রত্যেক জাতির জন্যে নিপূন হয়ে আছে এবং থাকবে। ইসলাম যে বিশ্বজনীন ধর্ম এটি তার অপর এক দৃষ্টান্ত।

মহানবী (সা.) ৬ষ্ঠ হিজরীতে তাঁর প্রতিনিধিদেরকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসকদের নিকট চিঠি দিয়ে পাঠান যার উপর “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” নামক মোহরাঙ্কিত ছিল এবং ইসলামের দাওয়াত দেন। এ চিঠিগুলোর সবই এক অর্থ বহন করছিল এবং তা ছিল তৌহীদের ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দাওয়াত।

যেহেতু মহানবীর দাওয়াতসমূহ আল্লাহর নির্দেশে এবং জনগণকে সাবধান করে দেওয়ার জন্য ছিল, তা মানুষের মাঝে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল।

এমনকি সত্য পিয়াসী ও ন্যায়পরায়ন ব্যক্তিরাই ইসলাম গ্রহণ করেন। যেমন : নাজজাশী, মুকুস এবং অন্যান্যরা...।<sup>১০২</sup>

গবেষণা করে দেখা গিয়েছে যে, রাসূল (সা.) বিভিন্ন দেশের বাদশা এবং গোত্রপতিদের কাছে মোট ৬২টি পত্র লিখেছিলেন। যার ২৯টি আমাদের নিকট রয়েছে।<sup>১০৩</sup>

বিভিন্ন দেশের বাদশা এবং গোত্রপতিদের কাছে প্রেরিত পত্র

এখানে রাসূল (সা.)- এর কয়েকটি পত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করব

## ১.ইরান সম্রাটের প্রতি প্রেরিত পত্র

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মুহাম্মদের পক্ষ থেকে পারস্যের বাদশাকে। দরুদ তাঁর প্রতি যে হেদায়াতের পথে চলে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে এবং যে এক আল্লাহর উপাসনা ও তাঁর বান্দা মুহাম্মদকে স্বীকৃতি দেয়।

আমি আল্লাহর নির্দেশে তোমাকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত করছি। আমি সকল মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি, এই জন্য যে, যাদের অন্তঃকরণ জীবিত তাদের ভীতি প্রদর্শন করব, যেন কাফেররাও কোন অজুহাত দেখাতে না পারে। যদি সন্ধি ও শান্তির সাথে থাকতে চাও তাহলে ইসলাম গ্রহণ কর। যদি অবাধ্য হও মাজুসদের (জারথুস্ত্র বা অগ্নি উপাসক) গোনাহ তোমার উপর বর্তাবে।<sup>১০৪</sup>

## ২.রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি প্রেরিত পত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

আমি তোমাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। যদি ইসলামের গণ্ডিতে আস তাহলে মুসলমানদের লাভ লোকসানের শামিল হবে। যদি তা না কর তবে জনগণকে স্বাধীন ভাবে ছেড়ে দাও; যেন ইসলাম গ্রহণ করতে পারে অথবা জিযিয়া কর দিতে পারে। তুমি তাদেরকে বাধা দিও না।<sup>১০৫</sup>

রাসূল (সা.)- এর পত্রসমূহ শুধুমাত্র বাদশাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের প্রতিও তিনি পত্র দিয়েছিলেন। যেন সকলেই ইসলামের উদিত সূর্য সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।

### ৩. ইয়ামামার শাসকের উদ্দেশ্যে প্রেরিত পত্র

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আল্লাহর বার্তাবাহক মুহাম্মদ এর পক্ষ থেকে ছায়াহকে। তার প্রতি দরুদ যে পথ প্রদর্শন করে হেদায়েত ও দীনকে অনুসরণ করে।

হে ইয়ামামার শাসক! তুমি জেনে রাখ যে, আমার দীন মানুষ যে পর্যন্ত যাবে তার শেষ পর্যন্ত পৌঁছবে। অতএব, যদি নিরাপদ থাকতে চাও তাহলে ইসলাম গ্রহণ কর।<sup>১০৬</sup>

## ৪. ইহুদীদের প্রতি

পত্রটি মুহাম্মদ (সা.)- এর পক্ষ থেকে যিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। তিনি মূসা ইবনে ইমরানের ভাই ও সাথি। আল্লাহ তাকে সেই দায়িত্ব দিয়েছেন যা মূসা কালিমুল্লাহকে দিয়ে ছিলেন। তোমাদেরকে আল্লাহ যা কিছু সিনাই পর্বতে মূসার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তার কসম দিচ্ছি। তোমরা কী তোমাদের আসমানী কিতাবে ইহুদী সমাজ এবং সমগ্র মানবজাতির প্রতি রাসূল হিসেবে আমার প্রেরিত হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে কিছু জেনেছ?! যদি জেনে থাক তাহলে আল্লাহকে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর। আর যদি এরূপ কিছু না পেয়ে থাক তাহলে তোমরা বাহানা করতে পার।<sup>১০৭</sup>



## ৫.নাজরানের পাদ্রীকে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

শুরু করছি ইবরাহীমের প্রভুর নামে। পত্রটি মুহাম্মদের পক্ষ থেকে নাজরানের পাদ্রীকে। আমি তোমাকে বান্দার উপাসনা থেকে, আল্লাহ পূজার দিকে যিনি প্রকৃত মাবুদ দাওয়াত করছি।<sup>১০৮</sup>

## ইসলাম প্রচারে আমাদের দায়িত্ব

ইসলামের দ্রুত অগ্রগতি প্রকৃত পক্ষে সব কিছুর উর্ধ্বে ইসলামের প্রিয় নবী (সা.) ও তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গীদের অহর্নিশ অক্লান্ত শ্রমের ফল। মহানবী (সা.) ইসলামের প্রচারের জন্যে দুটি শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করেছিলেন : একটি হলো বাগ্মী বক্তাগণ, যারা ইসলামের সত্যতাকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং মহানবীর প্রতি ছিল যাদের অকৃত্রিম বিশ্বাস ও ভালবাসা। আর অপরটি ছিল ইসলামের প্রাণবন্ত ও পরিপূর্ণ শিক্ষা সম্বলিত পত্রসমূহ।

মহানবী (সা.) যথাযথ মাধ্যমের অভাবে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে দূত পাঠাতেন।

এখন মহানবী (সা.)-এর আত্মা মুসলিম সমাজের জন্যে উদ্দিগ্ন যে, কিরূপে ইসলামের ঐশী মিশনের পথে কর্মতৎপরতা চালানো হবে। মুসলমানরা কি ইসলামী শিক্ষার সর্বজনীন প্রচারের জন্যে আধুনিক প্রচার ব্যবস্থা ও যুগোপযোগী পরিকল্পনাসমূহ গ্রহণ করছে কি?

বিশ্বজনীন রেসালাত ইসলামের প্রচারের জন্যে আমরা আমাদের সর্ব শক্তি নিয়োগ করব এবং ইসলামের প্রসারের জন্যে সকল ধরনের ত্যাগ তিতিক্ষার ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ পরিমাণে পিছপা হবো না। হোক সে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের কিন্তু সকল ভাই বোনকে এ প্রাণবন্ত ও জীবন সঞ্চারণী ঝর্ণা ধারা থেকে পিপাসা নিবারণের জন্যে আহ্বান করব; আর কল্যাণ ও খেদমতের অধিকারী হব। যেমনটি মহানবী (সা.) হযরত আলী (আ.)-কে বলেছিলেন :

আল্লাহর শপথ, যদি মহান আল্লাহ কোন মানুষকে তোমার মাধ্যমে হেদায়াত দান করেন, তবে সূর্য যাদের উপর আলোক প্রদান করে ও অস্তমিত হয়, তোমার জন্যে তার চেয়ে উত্তম কিছু রয়েছে...। (বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ৩৬১)

## হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ নবী

ইসলামের চিরন্তনতা ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর মাধ্যমে নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি

ইসলামের নবী (সা.)- এর সর্বশেষ নবী হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর একত্বের মতই সকলের নিকট সুস্পষ্ট ও প্রমাণিত। বলতে হয় : এ ব্যাপারে সকলেই একমত।

ইসলাম ধর্ম সর্বদা নতুন এবং দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তৃতি যত বেশি হবে এর সামগ্রিকতা ততটা সুস্পষ্টতর হতে থাকবে এবং এর বিস্ময় কখনোই শেষ হবে না।

এখন এ বিশ্বাসগত বিষয়ের বাস্তবরূপ বিশ্লেষণ করতে হবে।

প্রথমেই এক ধর্মের চিরন্তন হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহ বিশ্লেষণ করব। অতঃপর ইসলামকে এ দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করব :

১.কোন ধর্মের ফেতরাতগত (মানুষের সহজাত প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল) হওয়াটা ঐ ধর্মের চিরন্তনতার গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহক। যে দীনের মূল ভিত্তি মানুষের ফেতরাত ও প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে দীন সময়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সর্বদা অগ্রসরমান হয়ে থাকে এবং কখনোই নিঃশেষ ও নিস্তন্ধ হয়ে যায় না কিংবা কখনোই নিষ্ক্রিয় পুরোনো হয়ে পড়ে না।

২.যে সকল বিধি- নিষেধ স্থান ও কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় সকল প্রকার অগ্রগতির সাথেই তার সামঞ্জস্য বজায় থাকে এবং কখনোই কালের পরিক্রমণ তার উপর পরিবর্তনের রেখা টানতে পারে না।

অপরদিকে যে বিধান কোন নির্দিষ্ট বিশেষ সময় ও স্থানের জন্যে নির্দিষ্ট তা, সর্বকালের জন্যে সকল মানুষের চাহিদা মিটাতে অক্ষম। যেমন : যদি বলা হয় যে, যাতায়াতের ক্ষেত্রে মানুষ কেবলমাত্র প্রাকৃতিক বাহন যথা : ঘোড়া, উট ব্যবহার করতে পারবে, তবে এ নিয়ম কখনো অপরিবর্তিত থাকতে পারবে না এবং নিজ থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কারণ নতুন নতুন প্রয়োজন দেখা দিলে মানুষ নতুন মাধ্যম ব্যবহার করবেই।

পূর্ববর্তী দীনসমূহ বিদ্যমান ও অব্যাহত না থাকার একটি কারণ হলো এটাই যে, ঐগুলো বিশেষ সময়ের ও নির্দিষ্ট কোন সমাজের জন্যে ছিল।

৩. সামগ্রিকতা : চিরন্তন দীনকে সর্বজনীন হতে হবে এবং মানবতার সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম হতে হবে। মানবতার ঝগড়া বিক্ষুব্ধ আত্মার তৃষ্ণা এক শ্রেণীর ভ্রান্ত ও আচার সর্বস্ব অনুষ্ঠানাদি যেমন : সাক্ষ্য অধিবেশন, রুটি ও মদ্য পানাহার ও গলায় ক্রুশ ঝুলানোর মাধ্যমে পিপাসা নিবারণ হয় না। কিংবা প্রকৃত প্রশান্তি লাভ করে না। বরং এক সর্বজনীন বিধি-বিধানের প্রয়োজন যা তাকে সারা জীবন পথ নির্দেশনা দিয়ে যাবে এবং তার সামাজিক সমস্যাসমূহের সমাধান দিবে।

৪. অচলাবস্থার সময় পথ নির্দেশনা : সাধারণ নিয়মগুলো কখনো কখনো পারস্পরিক বিরোধ অথবা প্রয়োজন ও বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হওয়ার কারণে, মানুষকে অচলাবস্থার সম্মুখীন করে যেখানে সে জানে না কি করতে হবে!

এ কারণে চিরন্তন দীনে সাধারণ নিয়ম-কানুন ছাড়াও অন্যান্য নিয়মও থাকতে হবে যা জরুরী অবস্থায় বা সংকটময় মুহূর্তে কী করতে হবে সে বিষয়ের ব্যাখ্যা দিবে। আর কেবলমাত্র তখনই সকল সময় বা সর্বাবস্থার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হবে এবং সর্বদা ফলপ্রসূ হবে।

উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো চিরন্তনতার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে পরিগণিত যেগুলো ইসলামী বিধানে বজায় থেকেছে। এখন আমরা সেগুলোকে ব্যাখ্যা করব।

## ইসলাম এক চিরন্তন দীন

১. ইসলাম নীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে স্বয়ং মানুষের ফেতরাত ও প্রকৃতি যা সর্বদা বিদ্যমান থাকে তাকে বিবেচনা করেছে এবং এ ফেতরাতের প্রয়োজনে ইতিবাচক সারা দিয়েছে।

ইসলামের কর্মসূচী এমন ভাবে বিন্যস্ত হয়েছে যে, তাতে মানুষের সকল চাহিদা পূর্ণ হয়ে থাকে। যেমন : যৌন প্রয়োজন মিটানোর জন্যে একাধিক পদ্ধতি ও সহজ পরামর্শ দিয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে সে তা পূরণ করতে পারে। অপরদিকে বাঁধনহারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করে যাতে এর কুপ্রভাব ও অনাচার সমাজে বিস্তৃতি লাভ করতে না পারে।

২. ইসলামের মূল বিধি-বিধানসমূহ কোন বিশেষ কালের জন্যে নির্ধারিত নয় বলে কালের পরিবর্তনে বস্তুসমূহের পূর্ণতার সাথে পরিবর্তিত হয় না। বরং সকল কাল ও অবস্থার সাথে তা সামঞ্জস্য বজায় রাখে এবং যা কিছু সমাজের জন্যে প্রয়োজনীয় ও কল্যাণময় তা নির্ধারণ করে।

ইসলামের জিহাদ কর্মসূচীতে কখনোই দেখা যায় না যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ের বিদ্যমান যুদ্ধাঙ্গের (যেমন : তরবারী দিয়ে যুদ্ধ) উপর নির্ভর করতে। বরং সামগ্রিকভাবে এ নির্দেশ দেয় যে, ‘শত্রুদের মোকাবিলায় শক্তি সঞ্চয় কর যাতে নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে পার এবং তাদের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পার। এটি একটি সামগ্রিক নীতি যা সকল প্রকার অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ এবং সর্বকালের জন্যে দিক নির্দেশনা। অন্যান্য কর্মসূচীর ক্ষেত্রেও এরূপ অবস্থা বিদ্যমান।

৩. অচলাবস্থা ও জরুরী ক্ষেত্রে ইসলামের জরুরী আইন, অক্ষতি আইন (কায়েদায়ে লা যারার) ও অসংকীর্ণতা আইন (কায়েদেয়ে লা হারায়) ইত্যাদি আইন<sup>১০৯</sup> বিদ্যমান যেগুলোর মাধ্যমে যে কোন প্রকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। তাছাড়া ইমাম ও মহানবী (সা.) উত্তরাধিকারী এবং ফতোয়া দানকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে অচলাবস্থার সময় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারেন।

৪. ইসলামের কর্মসূচী অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বিস্তৃততর। ইসলামে আইনগত, অর্থনৈতিক, সামরিক শিষ্টাচারগত ইত্যাদি বিষয়গুলো উন্নততর প্রক্রিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। আর

এ বিষয়গুলোর উপর মুসলিম পণ্ডিতগণ সহস্র সহস্র কিতাব লিখেছেন যেগুলোর উৎস ছিল কোরআন, রাসূলের এবং তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের বক্তব্যসমূহ।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর আলোকে প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই অনুধাবন করতে পারে যে ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা যা সর্বদা মানুষের প্রয়োজনে ইতিবাচক সারা দিতে পারে। ফলে এমতাবস্থায় কোন নতুন দীন বা নবীর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে না।

## কোরআনের দৃষ্টিতে নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি

ইসলামের পরিপূর্ণতা ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এখন আমরা এগুলোর কিছু নমুনা তুলে ধরব :

(وَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)

সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ এবং তাঁর বাক্য পরিবর্তন করবার কেউ নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ (সূরা আনআম : ১১৫)।

(مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ)

মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী (সূরা আহযাব : ৪০)।

খাতাম (خاتم) শব্দটি ‘ت’ এর উপর ফাতহা (যবর) অথবা কাছরা (যের) সহ যখন কোন বহুবচন বিশিষ্ট শব্দের সাথে যুক্ত হবে, তবে তার অর্থ হবে ‘শেষ’। তাহলে উল্লিখিত আয়াতে খাতামান্নাবিয়্যিন<sup>১১০</sup> (خاتم النبیین)-এর অর্থ হলো আখিরান্নাবিয়্যিন (اخیرالنبیین) অর্থাৎ শেষ নবী। আর ‘নবী’ শব্দটি ‘রাসূল’ শব্দের চেয়ে ব্যাপক<sup>১১১</sup> (যা রাসূলকে ও সমন্বিত করে)

অতএব, সমস্ত পয়গম্বরগণই নবী ছিলেন। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতে যে বলা হয়েছে মুহাম্মদ খাতামান্নাবিয়্যিন অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) নবীদের সর্বশেষ নবী এবং তার পর না কোন নবী আসবে, না কোন রাসূল কিংবা না কোন কিতাবের অধিকারী; না অন্য কেউ।

(إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ)

এই কোরআন সর্বশ্রেষ্ঠ পথ নির্দেশ করে। নিঃসন্দেহে এমতাবস্থায় অন্য কোন কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে না (সূরা ইসরা : ৯)।

## হাদীসের দৃষ্টিতে নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি

খাতামিয়্যাতে ব্রূপারটি ইসলামী সনদসমূহে এতটা বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলামী বিশ্বাসমূহের একটি সুস্পষ্টতর বিষয় বলে পরিগণিত হয়।

এখন আমরা এর কিছু নমুনা সূধী পাঠকবৃন্দেব জন্যে তুলে ধরব :

১.স্বয়ং মহানবী (সা.) বলেন : জেনে রাখ, আমার পর কোন নবী আসবে না এবং আমার শরীয়তেব পর অন্য কোন শরীয়ত নেই। (মোস্তাদরাক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬২)

২.ইমাম বাকের (আ.) বলেন : মহান আল্লাহ্ তোমাদেব কিতাবেব মাধ্যমে সকল কিতাবেকে ও তোমাদেব নবীর মাধ্যমে সকল নবীর শেষ রেখা ও যবনিকা টেনেছেন (উসূলে কাফি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৭)।

৩.আলী (আ.) বলেন : মহান আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে সকল রাসূলেব পর পাঠিয়েছেন এবং তাঁব মাধ্যমেই ওহীব পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন (নাহজুল বালাগা )।

৪.মহানবী (সা.) আলী (আ.) বলেন : আমার সাথে তোমাব সম্পর্ক মূসাব সাথে হারূনেব সম্পর্কেব মত, পার্থক্য শুধু এটুকু যে, আমার পর কোন নবী আসবে না (কামিল, ইবনে আসিব, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৮)।

৫.হযরত রেযা (আ.) বলেন : হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর শরীয়াত কিয়ামত পর্যন্ত বিলুপ্ত হবে না এবং অনুরূপ কিয়ামত পর্যন্ত তাব পর আর কোন নবী আসবেন না (উয়ূনু আখবারূব রেযা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০)।

এছাড়া অন্যান্য অসংখ্য হাদীস বিদ্যমান যেগুলো হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর খাতামিয়্যাতে ও ইসলামেব চিরন্তনতােব এবং ইসলামেব পরিপূর্ণতা ও সত্যতােব প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে।

এ দীনেব বিষয়বস্তুর পূর্ণাঙ্গতা ও সমুল্লত ভাবার্থ এবং এর বিধানেব বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা, এর চিরন্তনতা ও নিত্য নতুনতােব নিশ্চয়তা প্রদান করে, যােব ফলে তা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যহত থাকবে।



অতএব, কতই না উত্তম যে, সে দীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্যে চেষ্টা করব এবং সকলকে এ পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক দীন থেকে লাভবান হতে আহ্বান করব।

## হাদীসে গাদীর এবং হযরত মুহম্মদ সা -(.এর স্থলাভিষিক্তি

রাসূল (সা.) আল্লাহর ঘর থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন

হিজরী সনের দশম বর্ষ এবং হজের মৌসুম। হেজাযের মরুভূমি বিশাল জনসমষ্টির সাক্ষী যাদের সকলেই একই ধ্বনি দিতে দিতে একই লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন।

ঐ বৎসর হজের দৃশ্যে এক অন্যরকম উদ্দীপনা এবং উত্তেজনা বিরাজ করছিল। মুসলমানেরা অধীর আগ্রহে এবং দ্রুতবেগে পথের দু'ধারে বাড়ী ঘর পেরিয়ে মক্কায় উপস্থিত হচ্ছিলেন।

মক্কা মরু প্রান্তরের লাক্বাইক আল্লাহুমা লাক্বাইক ধ্বনি কানে আসছিল। কাফেলা সমূহ পালাক্রমে শহরের নিকটবর্তী হচ্ছিল। হাজীগণ ইহরামের লেবাস পরে একই বেশে ধূলামেখে অশ্রু ঝরিয়ে আল্লাহর নিরাপদ হারামে উপস্থিত হচ্ছিলেন। আর যে গৃহ (কাবা) তৌহীদের মহান দৃষ্টান্ত হযরত ইবরাহীম (আ.) কতৃক নির্মিত তার চার পাশে তাওয়াফ করছিলেন।

ফরিদ ওয়াজদী দশম হিজরীতে অংশগ্রহণকারী হাজীদের সংখ্যা ৯০ হাজার বর্ণনা করেছেন<sup>১১২</sup> কিন্তু কোন কোন বর্ণনায় ১২৪০০০ বলা হয়েছে।<sup>১১৩</sup>

রাসূল (সা.) দেখতে পেলেন : মসজিদুল হারাম পূর্ণ এবং সকলেই এই আয়াত অনুসারে

“أنا المؤمنون اخوة” নিশ্চয় প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তি একে অপরের ভাই; ভ্রাতৃত্বের সাথে ফেরেশতগুণে গুণান্বিত হয়ে ইবাদতে মশগুল।

রাসূল (সা.) খুশী হলেন যে তিনি এ বৃহৎ কার্য সম্পাদন করতে পেরেছেন এবং তাঁর রেসালতের দায়িত্বকে উত্তম ভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

কিন্তু মাঝে মধ্যেই দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা তাঁর চেহারায় দৃশ্যমান হতো এবং আনন্দকে তাঁর জন্য অপ্রীতিকর করে তুলত।

তিনি ভয় পেতেন যে, তার মৃত্যুর পর হযরত জনতার এ সমষ্টি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে এবং তাদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ঐক্য লোপ পাবে ও পুনরায় অধঃপতিত হবে।

রাসূল (সা.) খুব ভাল করেই জানতেন যে, মুসলিম উম্মাহর জন্য এক ন্যায়পরায়ণ ও জ্ঞানী ইমামের পথ নির্দেশনা অতি জরুরী। আর এমনটি না হলে তাঁর দীর্ঘ দিনের মূল্যবান শ্রম বৃথা যাবে।

এ কারণেই মহানবী (সা.) যখনই সফর অথবা যুদ্ধের জন্যে মদীনার বাইরে যেতেন, এমনকি সে সফর সংক্ষিপ্ত হলেও তিনি বিশ্বস্ত এবং যোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করতেন এবং মদীনার জনগণকে অভিভাবকহীন রেখে যেতেন না।<sup>১১৪</sup>

সুতরাং কিরূপে বিশ্বাস করা সম্ভব যে, আমাদের প্রিয় ও সদয় নবী (সা.) বিশাল মুসলিম উম্মাহকে নিজের মৃত্যুর পর অভিভাবকহীন রেখে যাবেন। আর তিনি সবার চেয়ে ভাল জানেন যে এই পদমর্যাদার যোগ্য ব্যক্তি কে এবং খেলাফতের পোশাক কোন যোগ্য ব্যক্তির মাপে কাটা ও সেলাই করা হয়েছে।

তিনি সেই ব্যক্তি যাকে বহু সংখ্যক কুরাইশ সর্দার ও রাসূল (সা.)-এর আত্মীয়দের মাঝে ইসলামের দাওয়াতের জন্য যাদেরকে একত্রিত করা হয়েছিল, তাদের মাঝে নিজের উত্তরাধিকারী হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন।<sup>১১৫</sup>

তিনি পবিত্র ও একত্ববাদী ছিলেন। তিনি বিন্দুমাত্র শিরক ও মূর্তি পূজা করেন নি।

তিনি দীনে মুবিনে ইসলামের অগ্রগতির ক্ষেত্রে ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। তাঁর জ্ঞানের ভিত্তি রাসূল (সা.)-এর জ্ঞানের উৎস থেকেই। মজলুমের ডাকে সাড়া দান তাঁর উত্তম বিচার কার্যেরই অন্তর্ভুক্ত।<sup>১১৬</sup>

তিনি সবার নিকট পরিচিত। তিনি হলেন হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (আ.)।

পবিত্র হজ পালন করে সকলে আপন শহর অভিমুখে যাত্রা করেন। হঠাৎ রাসূল (সা.) (গাদীরে খুম নামক স্থানে) সকল হাজীদেরকে যাত্রা বিরতির নির্দেশ দেন। কেননা জিবরাইল (আ.) অবতীর্ণ হলেন এবং এই আয়াতটি তাঁকে জানালেন :

(يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس)

“হে রাসূল! তোমার প্রভুর নিকট হইতে তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা (লোকদের নিকট) পৌঁছিয়ে দাও এবং যদি তুমি এরূপ না কর তাহলে তুমি তাঁর বাণী আদৌ পৌঁছালে না। নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে মানুষের কবল হতে রক্ষা করবেন” (মায়েরা : ৬৭)।

যে বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে কড়া ভাষায় খেতাব করেছিলেন, তা ছিল আলী (আ.)-এর খেলাফতকে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রচার করা। রাসূল (সা.) বিষয়টি প্রচারে বিরত থাকছিলেন, কেননা ভয় পেতেন বিষয়টি মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও ফাটলের কারণ হতে পারে। তিনি তা প্রচারের জন্য অনুকূল পরিবেশের প্রতীক্ষায় ছিলেন। আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি অনুধাবন করলেন এখনই উপযুক্ত সময়। আর এই লক্ষ্যেই জনগণকে গাদীয়ে খুম নামক ধুধু মরুভূমিতে একত্রিত করলেন, যার মাধ্যমে ইসলামের প্রাণ অর্থাৎ খেলাফত ও উত্তরাধিকারের ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে যায়।

জনগণ বুঝতে পারছিলেন না যে কেন থামতে বললেন এবং কী এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটেছে। কিন্তু কিছু সময় না যেতেই যোহরের নামাজের জন্য আহ্বান করা হলো এবং নামাজ আদায় করার পর জনগণ রাসূল (সা.)-এর আকর্ষণীয় এবং আসমানী চেহারাকে মিস্বরের উপর (যা উটের হাউদায় দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছিল) দেখতে পেলেন।

সর্বত্র নিস্তব্ধ অবস্থা বিরাজ করছিল ... এমন সময় রাসূল (সা.)-এর মনোরম ও অর্থবহ বাণী মরুভূমির নিস্তব্ধতার অবসান ঘটাল। আল্লাহর প্রশংসার পর নিজের আসন্ন মৃত্যুর মর্মান্তিক খবর ঘোষণা করে বললেন :

হে লোক সকল! আমি তোমাদের জন্য কেমন নবী ছিলাম? সকলে সমস্বরে বলল : ইয়া রাসূল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সদুপদেশের ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ অবহেলা করেন নি। উপদেশ ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে উপেক্ষা করেন নি। আল্লাহ আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন (আপনি উত্তম রাসূল)। রাসূল (সা.) বললেন : আমার পর আল্লাহর কিতাব (কোরআন) ও পবিত্র মাসুমগণ (আমার আহলে বাইত) একত্রে তোমাদের পথ প্রদর্শক। তোমরা যদি এই দু’টিকে দৃঢ় ও পরিপূর্ণ ভাবে আকড়ে ধর তাহলে কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না।

অতঃপর আলী (আ.)- এর হস্ত মোবারককে এমন ভাবে উচ্ছে তুলে ধরলেন যে উপস্থিত সকলেই তাকে দেখতে পেলেন এবং বললেন :

লোকসকল! কোন সে ব্যক্তি যে মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের থেকে ও বেশি শ্রেয় এবং তাদের উপর বেলায়েত ও আধিপত্য রাখেন?

জনগণ বললেন : আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

রাসূল (সা.) বললেন : আল্লাহ্ হলেন আমার মাওলা (অভিভাবক) আর আমি মুমিনদের মাওলা এবং তাদের উপর তাদের নিজেদের চেয়েও বেশি অধিকার রাখি। অতঃপর বললেন : আমি যার মাওলা এবং যার প্রতি বেলায়েত ও আধিপত্য রাখি। এই আলীও আমার পর তাদের মাওলা।

من كنت مولاه فهذا علي مولاه.

এই বাক্যটিকে তিনবার আবৃত্তি করলেন। সবশেষে বললেন : এখানে উপস্থিত সকলে এ সত্য অন্যদের কাছে পৌঁছে দিবে।

জনগণ তখনো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েনি এমতাবস্থায় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো :

(اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دنيا)

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে (অনুগ্রহকে) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীনরূপে মনোনীত করলাম”( মায়েরদা : ৩)।

আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তরাধিকারী মনোনীত হওয়ার পর উপস্থিত জনতা মরিয়্যা হয়ে রাসূল (সা.)- এর উত্তরাধিকারী হযরত আলী (আ.)- কে মোবারক বাদ জানালেন।

প্রথম যে ব্যক্তি আলী (আ.)- কে মোবারকবাদ জানায় সে হলো আবু বকর, অতঃপর ওমর। তারা এই বাক্যগুলি বলছিল এবং আমিরুল মুমিনিন আলী (আ.)- এর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল :

بخ يا علي ابن ابي طالب اصبحت مولئى و مولى كل مومنين و المومنات

“শুভ হোক, হে আলী ইবনে আবি তালিব, আজ থেকে আপনি আমার এবং সকল মুসলিম নর-নারীর মাওলা বা নেতা হয়ে গেলেন।”<sup>১১৭</sup>

## হাদীসে গাদীরের বর্ণনাকারীগণ

প্রকৃত পক্ষে হাদীসে গাদীরের রাবীর সংখ্যা ১২০, ০০০। কেননা রাসূল (সা.)- এর নির্দেশ অনুযায়ী সকলেই এই সফরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে এ হাদীসটি অন্যদের কাছে বর্ণনা করেন।<sup>১১৮</sup> আর এ কারণেই মুসলমানদের সর্বস্তরে গাদীরের ঘটনাটি প্রতিবারই নতুন করে জীবিত হয়েছিল।

গাদীরে খুমেের ঘটনার প্রায় ২৫ বৎসর পর অর্থাৎ যখন রাসূল (সা.)- এর অধিকাংশ সাহাবীরা ইহধাম ত্যাগ করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক জীবিত ছিলেন; আলী (আ.) জনগণকে বললেন : আপনাদের মধ্যে যারা গাদীরে খুমে উপস্থিত ছিলেন এবং রাসূল (সা.)- এর মুখ থেকে হাদীসে গাদীর শ্রবণ করেছিলেন, সাক্ষ্য দান করুন।

ঐ বৈঠকেই ৩০ জন রাবী উঠে দাঁড়িয়ে হাদীসে গাদীর সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন।<sup>১১৯</sup>

মুয়াবিয়ার মৃত্যুর ১ বৎসর পূর্বে (অর্থাৎ ৫৯ হিজরীতে) ইমাম হুসাইন (আ.) বনি হাশেম, আনসার এবং সকল হাজীদেরকে “মিনায়” একত্রিত করে বক্তৃতার এক পর্যায়ে বললেন : আপনাদেরকে আল্লাহর শপথ করে বলছি, জানেন কি রাসূল (সা.) গাদীরে খুমে আলীকে মুসলিম উম্মাহর নেতা ঘোষণা করেছিলেন এবং উপস্থিত সকলকে তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন?

সকলে বলল : জী হ্যাঁ।<sup>১২০</sup>

আহলে সুন্নাতেের পণ্ডিতরা তাদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে রাসূল (সা.)- এর ১১০ জন সাহাবী যারা স্বয়ং মহানবীর থেকে হাদীসে গাদীর শুনেছেন এবং অন্যদের কাছে বর্ণনা করেছেন তাদের নাম উল্লেখ করেছেন।<sup>১২১</sup> আরও কিছু পণ্ডিতগণ হাদীসে গাদীর এবং গাদীরের ঘটনা সম্পর্কে বিশেষ কিতাবও রচনা করেছেন।<sup>১২২</sup>

## হাদীসে গাদীরের তাৎপর্য

স্পষ্ট দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ‘মাওলা’ এবং ‘ওয়ালী’ শব্দের অর্থ হলো মুসলিম উম্মাহর উত্তরাধিকারী ও অভিভাবক এবং অন্য অর্থের সাথে সংগতি রাখে না। এখন নিম্নের বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য করুন :

১. ইতোমধ্যেই আমরা জেনেছি যে, রাসূল (সা.) হাদীসে গাদীর উপস্থাপন করতে ভয় পাচ্ছিলেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তিনি তা ঘোষণা করেন নি।

তাহলে একথা বলা সম্ভব নয় যে হাদীসে গাদীরের উদ্দেশ্য হলো রাসূল (সা.)- এর সাথে আলী (আ.)- এর বন্ধুত্বকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া? যদি উদ্দেশ্য তাই হতো, তাহলে তা প্রচার করাতে ভয়ের কোন কারণ ছিল না এবং তাতে মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট হতো না। সুতরাং উদ্দেশ্য খেলাফত ও উত্তরাধিকারীর ব্যাপারই ছিল। আর এ ভীতি বিদ্যমান ছিল যে, এই বিষয়টি প্রচার করলে কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী ঔদ্যত্য প্রকাশ করতে পারে।

২. রাসূল (সা.) “মান কুনতু মাওলা ফাহাযা আলীযুন মাওলা” বলার পূর্বে জনগণের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন যে, তিনি মুমিনদের নিজেদের অপেক্ষা তাদের উপর অধিক অধিকার রাখেন এবং উম্মাহের কর্ণধার। অতঃপর ঐ স্থানকে আলীর জন্যেও নির্ধারণ করলেন এবং বললেন : “আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা।”

৩. হাসসান ইবনে ছাবেত গাদীরের ঘটনাটিকে রাসূল (সা.)- এর অনুমতিক্রমে কবিতার ভাষায় বর্ণনা করেন এবং রাসূল (সা.) তাতে অনুমোদন দেন। হাসসানের কবিতায় আলী (আ.)- এর খেলাফত ও ইমামতের মর্যদাকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে কিন্তু ব্যাপক জনসমষ্টির কেউই প্রতিবাদ করেন নি যে কেন “মাওলা” শব্দের ভুল অর্থ করছ। বরং সকলেই তার প্রশংসা করেছিলেন এবং স্বীকৃতিদান করেছিলেন।

কবিতাটির কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি :

فقاله قم يا علي فإني رضيتك من بعدي اماما وهاديا

فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له اتباع صرق عوالي

অর্থাৎ রাসূল (সা.) আলীকে বললেন : ওঠ হে আলী আমার পর তুমিই হলে উম্মতের নেতা ও ইমাম। সুতরাং আমি যার মাওলা এবং যার দীনি ও ঐশী কর্ণধার এই আলীও তার মাওলা এবং অভিভাবক। অতএব, তোমরা সকলেই আলীর প্রকৃত অনুসারী হও।

৪. অনুষ্ঠান শেষে রাসূল (সা.) হযরত আলী (আ.)-কে নিয়ে একটি তাঁবুর মধ্যে বসলেন এবং সকলকে এমনকি তাঁর স্ত্রীদেরকেও হযরত আলীকে অভিনন্দন জানাতে বললেন এবং তাঁর হাতে বাইয়াত করতে বললেন। আর আমিরুল মুমিনীন হিসাবে হযরত আলীকে সালাম জানাতে বললেন।<sup>১২৩</sup> এটা স্পষ্ট যে, এ অনুষ্ঠান শুধুমাত্র তাঁর খেলাফত ও ইমামতের সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৫. রাসূল (সা.) দু'বার বলেছিলেন : هئوني অর্থাৎ আমাকে অভিনন্দন জানাও। কেননা আল্লাহ তায়ালা আমাকে শ্রেষ্ঠ নবী ও আমার আহলে বাইতকে উম্মতের জন্য ইমাম নির্বাচন করেছেন।<sup>১২৪</sup> এসকল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার পর হাদীসে গাদীর সম্পর্কে আর কোন রূপ সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।



## হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

### সমাজে নৈতিক চরিত্রের (আখলাকের) প্রয়োজনীয়তা

জ্ঞান ও শিল্পের যত বিকাশ ঘটবে নৈতিক চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা ততই বৃদ্ধি পাবে। এর সমস্তরালে রাসূল (সা.)- এর নির্দেশাবলীকে বাস্তবায়ন করা একান্ত জরুরী। কেননা জ্ঞান ও শিল্পের বিশ্ব শুধুমাত্র যন্ত্রপাতি এবং উপায় উপকরণকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। কিন্তু তা থেকে অন্যান্য সুযোগ- সুবিধা গ্রহণ রোধের কোন নিশ্চয়তা দিতে পারছে না।

অপরাধ, অত্যাচার, দুর্নীতি, খুন, দুষ্কর্ম, আত্মহত্যা ইত্যাদির বিস্তৃতি এই সত্যের জ্বলন্ত প্রমাণ। নৈতিক চরিত্র যা আল্লাহর রাসূলগণের একটি বিশেষ দিক, যদি তা সমাজে প্রতিষ্ঠা না পায় তাহলে জ্ঞান ও বিজ্ঞান মানুষের কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবেনা। বরং স্বৈরাচারীরা জ্ঞান বিজ্ঞানকে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে এবং কোটি কোটি মানুষকে গৃহহীন করেছে। যেমনটি আমাদের চোখের সামনে ঘটছে! তারা দুর্বল রাষ্ট্র সমূহের অধিকারকে পদদলিত করছে এবং তাদেরকে রক্তাক্ত করছে।

শুধুমাত্র প্রকৃত নৈতিক চরিত্রই মানুষের ঔদ্ধত্য মনোভাব, প্রবৃত্তির তান্ডব এবং পাপাচার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর এর মাধ্যমেই জ্ঞান- বিজ্ঞানকে সার্বিক শান্তির পথে এবং শান্তিপূর্ণ জীবনের পথে পরিচালিত করতে পারে, যা হলো প্রকৃত ঈমান আর তার উৎস হলো মহান আল্লাহ তায়াল।

নবিগণের নৈতিক শিক্ষা ও তাঁদের আচরণই হলো উত্তম উপায়, যা মানুষকে এক আদর্শ জীবন দান করতে পারে। নৈতিক চরিত্র প্রতিটি মানুষের জন্য একান্ত প্রয়োজন আর তা ব্যক্তি জীবনেই হোক অথবা সামাজিক জীবনে। তবে সমাজের নেতৃত্ব ও হেদায়েত যাদের উপর অর্পিত হয়েছে তাঁদের জন্য (নৈতিক চরিত্র) অতি জরুরী। কেননা

**প্রথমতঃ** যিনি সমাজের শিক্ষক তাঁকে অবশ্যই নৈতিক চরিত্রের আদর্শ এবং মনুষ্য বৈশিষ্ট্যে উৎকৃষ্ট হতে হবে। তাহলেই তিনি অন্যদের অন্তর থেকে নৈতিক কলুষতাকে ধুয়ে ফেলতে পারবেন।

আর যদি তিনি নিজেই এ মূল্যবান সম্পদ (চরিত্র) থেকে বঞ্চিত হন, কখনোই পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে পারবেন না।

**দ্বিতীয়তঃ** সমাজকে হেদায়াত করার দায়িত্ব এতই কঠিন যে, নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত তা বহন করতে পারবে না। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবিগণকে এমন ব্যক্তিদের মধ্য হতে নির্বাচন করেছেন যারা ছিলেন সমুন্নত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, সহিষ্ণু এবং সকল প্রকার নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। আর এ চরিত্র নামক অস্ত্রের মাধ্যমেই তারা বিশৃঙ্খলায় নিমজ্জিত সমাজসমূহে পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং কলুষিত ও বঞ্চিত জনগণকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

পবিত্র কোরআনে রাসূল (সা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে :

(فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك)

অর্থাৎ “আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলে; যদি তুমি রুঢ় ও কঠোর চিত্ত হতে তবে তারা তোমার নিকট হতে সরে পড়ত”<sup>১২৫</sup>

মহানবী (সা.)- এর উত্তম চরিত্রই ইসলামের পবিত্র বিপ্লবের চেউয়ের মাধ্যমে সর্ব প্রথম আরব সমাজে অতঃপর সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। আর এই মহান আধ্যাত্মিক বিপ্লবের মাধ্যমে বিক্ষিপ্ততা ঐক্যে রূপান্তরিত হয়। বেপরোয়া (বেহায়াপনা) সচ্চরিত্রতায় রূপান্তরিত হয়। বেকারত্ব শ্রমে রূপান্তরিত হয়। স্বার্থপরতা সমষ্টির হিতাকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত হয়। অহংকার, বিনয় ও ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়। আর এর মাধ্যমে এমন সকল ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে ছিল যারা সর্বকালের জন্য নৈতিক চরিত্রের আদর্শ হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছেন। রাসূল (সা.)- এর চরিত্র এতই উত্তম ও মূল্যবান ছিল যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মহান চরিত্র বলে উল্লেখ করেছেন :

(وَأَنَّكَ لَعَلِي خَلَقَ عَظِيمًا)

“তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত”<sup>১২৬</sup>

## সর্বসাধারণের মধ্যে মহানবী (সা.)

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন মহান রেসালত ও নেতৃত্বের মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু সমাজে তাঁর জীবনযাপন ও ওঠা-বসা এতই সাধারণ ছিল যে, যদি সাহাবাদের সাথে একত্রে বসে থাকতেন; অপরিচিত কেউ সেখানে উপস্থিত হলে প্রশ্ন করতে বাধ্য হতো যে, আপনাদের মধ্যে কে মুহাম্মদ (সা.)।<sup>১২৭</sup>

দুনিয়া তাঁকে অহংকারী করতে পারেনি এবং তিনি দুনিয়ার বাহ্যিক চাকচিক্যে কখনও আকৃষ্ট হননি। বরং সচ্চরিত্র এবং সংযমী দৃষ্টিতে সেদিকে দৃষ্টিপাত করতেন।<sup>১২৮</sup>

রাসূল (সা.) সর্বদা সংক্ষেপে অথচ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলতেন এবং কখনোই অন্যের কথার মধ্যে কথা বলতেন না।<sup>১২৯</sup>

কথা বলার সময় চেহারা বিকৃত করতেন না এবং কখনোই কর্কশ ও জটিল বাক্য ব্যবহার করতেন না।<sup>১৩০</sup>

যখনই শ্রোতাদের সম্মুখে দাঁড়াতে দাস্তিকের ন্যায় বক্র চোখে দৃষ্টিপাত করতেন না।<sup>১৩১</sup>

যখনই কোন সভায় প্রবেশ করতেন, খালি জায়গা পেলে সেখানেই বসে পড়তেন। এমনটি ছিলনা যে জলসার অগ্রভাগেই বসবেন।<sup>১৩২</sup>

কাউকে তাঁর পায়ের সামনে দাঁড়াতে দিতেন না, তবে সকলকে তিনি সম্মান দেখাতেন। কিন্তু পরহেজগারদেরকে তিনি বেশি সম্মান করতেন।<sup>১৩৩</sup>

মহানবী (সা.) শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যেই ক্রোধান্বিত হতেন এবং তাঁর জন্যেই সন্তুষ্ট হতেন। যখন সওয়ার অবস্থায় থাকতেন কাউকে তাঁর সাথে হেঁটে আসার অনুমতি দিতেন না। চাইলে তাকেও সওয়ার করিয়ে নিতেন আর তা না হলে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সাক্ষাতের কথা দিতেন এবং একা যেতেন।

সমষ্টিগতভাবে সফরে গেলে, নিজের কাজ নিজেই করতেন এবং কখনোই কারো বোঝা হতেন না। এক সফরে সাহাবারা বললেন : আমরাই সকল কাজ করব। রাসূল (সা.) বললেন : আমার

এবং তোমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাক তা আমি পছন্দ করিনা। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে অন্যদের থেকে ভিন্ন দেখতে পছন্দ করেন না। অতঃপর উঠে গেলেন এবং কাঠ সংগ্রহ করলেন।<sup>১৩৪</sup>

- চুক্তির ক্ষেত্রে সর্বদা বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতেন।
- আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতেন এবং বিনা কারণে তাদের পক্ষপাতিত্ব করতেন না।
- কাউকে অন্যের বিরুদ্ধে বলার অনুমতি দিতেন না। বলতেন : আমি জনগণের সাথে পবিত্র হৃদয়ে কথা বলতে পছন্দ করি।
- রাসূল (সা.) লজ্জার দিক থেকে ছিলেন নজীর বিহীন।
- সহনশীল ও মহানুভব ছিলেন।<sup>১৩৫</sup>

আনাস ইবনে মালেক (যিনি মহানবীর খাদেম ছিলেন) বলেন :

রাসূল সেহেরী ও ইফতারীর জন্য দুধ সংগ্রহ করতাম। এক রাতে রাসূল (সা.)- এর ফিরতে দেরী হতে দেখে মনে করলাম তিনি নিমন্ত্রণে গিয়েছেন এবং সেখানে ইফতার করেছেন আর এই মনে করে দুধটা পান করে নিলাম। কিছুক্ষণ পরই রাসূল (সা.) ফিরে এলেন তার সাথীদের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূল (সা.) ইফতার করেছেন? বলল : না।

রাসূল (সা.) যখন ঘটনাটি জানতে পারলেন আমাকে কিছুই বললেন না এবং ক্ষুধা অবস্থায় হাসি মুখে রাত্রি কাটালেন এবং ঐ অবস্থায় রোযা রাখলেন।<sup>১৩৬</sup>

রাসূল (সা.) নামাজ ও ইবাদত খুব বেশি পছন্দ করতেন কিন্তু যদি লোকজন কোন কাজে আসত তিনি নামাজ সংক্ষিপ্ত করতেন এবং তাদের কার্য সম্পাদন করতেন। তিনি জনগণের প্রয়োজন মিটাতে কোন প্রকার অসম্মতি জানাতেন না।

সকলকেই সম্মান করতেন। ফযিলত ও মর্যাদাকে তিনি ঈমান ও আমলের মধ্যে নিহিত মনে করেন। ধন- দৌলত এবং পার্শ্ব পদের তোয়াককা করতেন না।

দাসদের সাথে সদয় আচরণ করতেন এবং তাদের সমস্যা সমাধানে সদা সচেষ্ট ছিলেন।<sup>১৩৭</sup>

## মহানবী (সা.)- এর মহত্ব ও মহানুভবতা

যদি কেউ তাঁকে অসম্মান করত তিনি তার প্রতিশোধ নিতেন না। অন্যদের ভুল ও দুর্ব্যবহারকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন। তাদের অত্যাচার ও নিপীড়নের বিপরীতে ক্ষমা মহানুভবতা এবং বদান্যতা প্রকাশ করতেন।<sup>১৩৮</sup>

কুরাইশদের শত অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করে ও তিনি মক্কা বিজয়ের পর তাদেরকে ক্ষমা করেছিলেন এবং মুক্তি দিয়েছিলেন।<sup>১৩৯</sup>

ওহুদের যুদ্ধে ওয়াহশী নামক এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)- এর চাচা হযরত হামজাকে শহীদ করেছিল কিন্তু তিনি তাকে ক্ষমা করেছিলেন। অনুরূপভাবে আবু সুফিয়ান ও হিন্দা যারা রাসূল (সা.)- এর প্রতি চরম অবিচার করেছিল তাদেরকেও ক্ষমা করেছিলেন এবং কখনোই প্রতিশোধের চিন্তায় ছিলেন না।<sup>১৪০</sup> তবে তিনি এতবেশি দয়াশীল ও ক্ষমাশীল হওয়া সত্ত্বেও যদি কখনো কেউ ইসলামের সীমারেখাকে অতিক্রম করত কোনরূপ নমনীয়তা দেখাতেন না। বরং আল্লাহর বিধান জারি করতেন এবং কারো মধ্যস্থতাকে গ্রহণ করতেন না।

যখন জানতে পারলেন “ফাতিমাহ মাখযুমী” চুরি করেছে ওসমান বিন যাইদের মধ্যস্থতায় কর্ণপাত করলেন না। বললেন : পূর্ববর্তী গোষ্ঠীসমূহের ধ্বংস ও বিলুপ্তি এ কারণে হয়েছিল যে, তারা সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকদের উপর শরীয়তের হুকুম জারী করত না। আল্লাহর শপথ! যদি আমার কন্যা “ফাতেমা যাহরা” এহেন কর্ম করত আমি তার হাত কেটে ফেলতাম।<sup>১৪১</sup>

## মহানবী (সা.) ও পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা

ইসলামের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) খুব বেশি আতর পছন্দ করতেন।<sup>১৪২</sup> তিনি এর পিছনে খাদ্যের চেয়ে বেশি খরচ করতেন।<sup>১৪৩</sup> তিনি যে রাস্তা দিয়ে যেতেন তাঁর আতরের সুগন্ধ ছড়িয়ে যেত। পরবর্তীতে কেউ ঐ রাস্তা দিয়ে গেলে বুঝতে পারত যে, রাসূল (সা.) এ পথ দিয়ে গিয়েছেন।<sup>১৪৪</sup>

রাসূল (সা.) বেশি বেশি মেসওয়াক করতেন।<sup>১৪৫</sup> খাবার খাওয়ার পূর্বে ও পরে তার হস্ত মোবারক ধৌত করতেন।<sup>১৪৬</sup> ঘর থেকে বাইরে বেরোবার সময় আয়না অথবা পানিতে চেহারা দেখতেন এবং পরিপাটি হয়ে বের হতেন।<sup>১৪৭</sup>

## মহানবী (সা.)- এর ধার্মিকতা ও ইবাদত

প্রিয় নবী (সা.) নামাযকে খুব বেশি ভালবাসতেন এবং গভীর রাতে কয়েকবার করে উঠে মেসওয়াক করে নামায পড়তেন।<sup>১৪৮</sup> তাঁর প্রভুর প্রার্থনায় এমন ভাবে মশগুল হতেন যে, দীর্ঘসময় ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাকতেন। ফলে তাঁর পা ফুলে যেত।<sup>১৪৯</sup>

তিনি আসমান যমিন, সূর্য দেখে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন এবং বিশেষ করে এ সমস্তও সৃষ্টিকর্তার মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ বলে এর প্রতি মনোযোগ দিতেন। তিনি এত বেশি ধর্মপ্রাণ ছিলেন যে, কখনোই দুনিয়ার বাহ্যিক রূপের প্রতি আকৃষ্ট হতেন না।

মহানবী (সা.) সকল চারিত্রিক গুণাবলীতে ছিলেন দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তাঁর ধরণ ও পুত পবিত্র চরিত্রকে এই সামান্য লেখনিতে ব্যাপক ভাবে তুলে ধরা অসম্ভব। আমরা যা করতে পারি তা হলো, তাঁর নুরানী চেহারার এক ছায়ামূর্তি গড়তে। যার মাধ্যমে মুসলমানরা (যারা নিজেদেরকে ইসলামের অনুসারী মনে করে) রাসূল (সা.)- এর স্বভাব- চরিত্রকে তাঁদের আদর্শ হিসাবে মনে করেন এবং তাঁর থেকে জীবন- যাপন প্রণালী এবং সঠিক চারিত্রিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন।

যেমনটি পবিত্র কোরআনেও বর্ণিত হয়েছে :

(لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)

“নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রয়েছে।”<sup>১৫০</sup>

আল্লাহর সালাম বর্ষিত হোক তাঁর উপর যিনি ছিলেন উত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। ফেরেশতা এবং পবিত্র ব্যক্তিদের দরুদ তাঁর উপর বর্ষিত হোক। আমাদের ও আপনাদের সবার দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর উপর।



## রাসূল (সা.)- এর উত্তরাধিকারী ও খেলাফত

প্রতিটি মানব সমাজই সমাজের অগ্রগতির জন্য এক নেতা ও অভিভাবকত্বের প্রয়োজনীয়তাকে অনুধাবন করে। আর একারণেই কোন রাষ্ট্রনায়ক মারা গেলে জনগণ আর এক রাষ্ট্রনায়কের প্রয়োজনীয়তাকে অনুধাবন করে, যিনি শাসন ভার নিজ হাতে তুলে নিবেন। কেউই রাজি নন যে সমাজ শাসক ও অভিভাবকহীন থাকুক। কেননা আপনারা জানেন যে সমাজের কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে এবং তা বিশৃঙ্খলা কবলিত হবে।

ইসলামী সমাজ নিজেও এক বৃহৎ মানব সমাজ হিসাবে এ বিষয়টিকে অনুভব করে এবং জানে যে রাসূল (সা.)- এর তিরোধানের পর ইসলাম নেতা বা শাসক চায় যার মাধ্যমে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

কিন্তু যেহেতু এ প্রয়োজনীয়তার বিভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রতিটি গোষ্ঠীই রাষ্ট্রনায়কের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিজেস্ব মতামত রাখেন এবং সে উদ্দেশ্য মোতাবেক বিচার করেন। সে কারণেই কিছু সংখ্যক মুসলমানরা মনে করেন যে, রাষ্ট্রনায়কের দায়িত্ব কেবল মাত্র রাষ্ট্র গঠন করাই। মনে করেন যে, রাসূল (সা.)- এর খেলাফত ও উত্তরাধিকারী নির্বাচনযোগ্য এবং মুসলমানরা নিজেরাই তাদের পছন্দনীয় ব্যক্তিকে রাসূল (সা.)- এর উত্তরাধিকারী হিসাবে নির্বাচন করতে পারেন।

এর বিপরীতে শিয়া মাযহাবের অনুসারীরা তাত্ত্বিক, দার্শনিক যুক্তির ভিত্তিতে এবং কোরআনের আয়াত ও অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে এ বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। তারা শাসন কর্তা এবং রাসূল (সা.)- এর উত্তরাধিকারীর উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তাকে মানুষের সার্বিক পরিপূর্ণতা হিসেবে মনে করেন এবং বলেন : যে রাষ্ট্রনায়ক এ গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারবেন, তিনি হলেন স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত। তিনি নবিগণের ন্যায় জনগণের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক চাহিদাকে সম্পূর্ণরূপে চিহ্নিত করে আল্লাহর প্রকৃত হুকুম অনুসারে তার সমাধান করবেন। আর

এর মাধ্যমেই মানুষের প্রকৃত পরিপূর্ণতার এবং সর্বজঙ্গীন কল্যাণের পথ সুগম করতে সক্ষম হবেন।

এখন শিয়াদের দৃষ্টিতে রাসূল (সা.)- এর উত্তরাধিকারীর প্রকৃত উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করা হবে যার মাধ্যমে এ ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হবে যে, কেন রাসূল (সা.)- এর উত্তরাধিকারী থাকা প্রয়োজন?

রাসূল (সা.) এর উত্তরাধিকারী থাকার প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তারই অনুরূপ। অথবা এর মাধ্যমেই ঐ মূল উদ্দেশ্যের সফলতা অর্জিত হয়। সার্বিক হেদায়াতের স্থির ও অনিবার্য কারণ অনুযায়ী সৃষ্টির প্রতিটি অস্তিত্বের জন্য অস্তিত্বের পথে তার পরিপূর্ণতার সকল মাধ্যম ও বিদ্যমান, যার মাধ্যমে তার শ্রেণী ও প্রকৃতি অনুযায়ী পূর্ণতা ও কল্যাণের দিকে দিক নির্দেশিত হয়।

মনুষ্য শ্রেণী ও এ বিশ্বজগতের একটি অস্তিত্ব এবং এই চিরন্তন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্যই মানুষ সৃষ্টির নিয়মানুযায়ী যা মানুষের পার্থিব ও আত্মিক, শারীরিক ও মানসিক চাহিদানুযায়ী এবং কোন প্রকার ব্যক্তি স্বার্থ ও বিভ্রান্তির উর্ধ্বে সুসজ্জিত হয়েছে তার দ্বারা হেদায়াত প্রাপ্ত হবে। আর এর মাধ্যমেই মানুষের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ নিশ্চিত হয়।

এ কর্মসূচী অনুধাবন করা আকল বা বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি বিচ্যুতি, ভ্রান্ত চিন্তা এবং আবেগ থেকে মুক্ত নয়। আর তা এক সার্বিক কর্ম এবং পরিপূর্ণ কর্মসূচী সরবরাহ করতে সক্ষম নয়। বরং অবশ্যই এক নবীর প্রয়োজন যিনি ওহীর মাধ্যমে ঐ পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হবেন এবং সামান্যতম বিচ্যুতি ও ভ্রান্তি ছাড়াই মানুষকে তা শিক্ষা দিবেন। আর এর মাধ্যমেই প্রতিটি মানুষের জন্য কল্যাণের পথ সুগম হবে।

এটা স্পষ্ট যে, এই দলিল যেমন জনগণের মধ্যে নবীর প্রয়োজনীয়তাকে প্রমাণিত করে, তেমনি নবীর প্রতিনিধি বা ইমাম হিসাবে এক ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তাকেও প্রমাণ করে। যিনি নিখুঁত এ কর্মসূচীকে রক্ষা করবেন এবং কোন প্রকার হ্রাস বৃদ্ধি ছাড়াই তা জনগণকে শিক্ষা দিবেন। তাছাড়া নিজের সঠিক ও সুন্দর আচার- ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণকে প্রকৃত পরিপূর্ণতা

ও কল্যাণের দিকে পরিচালিত করবেন। কেননা ইহা ব্যতীত মানুষ তার প্রকৃত পরিপূর্ণতায় উন্নীত হতে পারে না। পারেনা তার আল্লাহ প্রদত্ত সুপ্ত প্রতিভাকে প্রস্ফুটিত করতে। পরিশেষে এই প্রতিভাসমূহ অব্যবহৃত থেকে যায় এবং অহেতুক হয়ে পড়ে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এমনটি কখনোই করবেন না। কেননা এটা সঠিক নয় যে, তিনি উৎকর্ষ ও পরিপূর্ণতার প্রতিভা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করবেন অথচ তা থেকে উপকৃত হওয়ার পন্থা বলে দিবেন না।

ইবনে সিনা তার ‘শাফা’ নামক গ্রন্থে লিখেছেন : যে খোদা মানুষের দ্রুত এবং পায়ের নিচের গর্ত যা আপাত দৃষ্টিতে ততটা প্রয়োজনীয় মনে হয় না সৃষ্টি করতে অবহেলা করেননি। এটা হতেই পারেনা যে, তিনি সমাজকে নেতা এবং পথ প্রদর্শক ছাড়াই রেখে দিবেন যা না হলে মানুষ প্রকৃত কল্যাণে উপনীত হতে পারে না।<sup>১৫১</sup>

একারণেই শিয়ারা বলেন : গায়েবী মদদ অব্যাহত রয়েছে এবং ঐশী জগৎ মর্তজগতের মধ্যে সার্বক্ষণিক সংযোগ বিদ্যমান রয়েছে।

এ যুক্তির মাধ্যমে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সা.)- এর উত্তরধিকারী অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত হতে হবে এবং সর্বপ্রকার গোনাহ ও ত্রুটি থেকে পবিত্র ও মাসুম হতে হবে। যে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত নয় সে প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হবে এবং সে ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। ফলে সে মানুষের সঠিক কল্যাণকে চিহ্নিত করতে, প্রকৃত ও সম্পূর্ণ সুরক্ষিত দীন মানুষকে শিক্ষাদিতে অপারগ হয়ে পড়বে, যার মাধ্যমে জনগণ প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারে এবং পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে।<sup>১৫২</sup>

মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে বলেছেন : মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে জীবনের সকল বিষয়ে আল্লাহর নির্বাচিত বান্দাগণের অনুসরণ করবে।

(يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم)

অর্থাৎ “হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর এই রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা আদেশ দেয়ার অধিকারী (উলিল আমর)”।<sup>১৫৩</sup>

এটা স্পষ্ট যে, উলিল আমর যাদের আনুগত্যকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলের আনুগত্যের ন্যায় অনিবার্য করেছেন এবং সকল বিষয়ে তাদের আনুগত্য করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তাঁরা হলেন আল্লাহর সেই মনোনীত বান্দাগণ যাদের মধ্যে ভুল-ত্রুটি এবং ব্যক্তি স্বার্থের কোন স্থান নেই। তাঁরাই মানুষকে সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। তারা নয় যারা অবিরাম তাদের কথাবার্তা এবং চাল-চলনে হাজারও ভুল করে। তাদের অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ হেদায়াত প্রাপ্ত হয়না এবং প্রকৃত পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না।<sup>১৫৪</sup>

## রাসূল (সা.) কি তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন?

যে রাসূল (সা.) ইসলামকে তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনে করতেন এবং সকলের চেয়ে ভাল করে জানতেন যে, প্রকৃত ইসলামকে অবশ্যই মনুষ্যজগতে টিকে থাকতে হবে।

কাজেই এটা কল্পনাও করা যায় না যে, তিনি আল্লাহর মনোনীত নিজের প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে পরিচয় না করিয়েই মৃত্যুবরণ করবেন। প্রিয় নবী (সা.) তাঁর রেসালতের শুরু থেকেই এ বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে তাঁর প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে স্পষ্ট ভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

যে কেউ রাসূলের বাণীসমূহের উপর চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে, রাসূল (সা.)- এর দৃষ্টি আলী (আ.) ও তাঁর পবিত্র বংশধরের প্রতি ছিল। আর এ বিষয়ে তিনি অন্য কারো উপর দৃষ্টি দেননি।

এখন এ বিষয়ে বর্ণিত রাসূল (সা.)- এর কিছু বাণীর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব :

১. রাসূল (সা.) ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকেই তাঁর আত্মীয়- স্বজনকে মক্কায় একত্রিত করে (দাওয়াতে যুল আশিরাহ) বলেছিলেন : আলী হচ্ছে আমার ওয়াসী এবং উত্তরাধিকারী, অবশ্যই তার অনুসরণ করবে।<sup>১৫৫</sup>

২. শিয়া এবং সুন্নী পণ্ডিতগণ উভয়েই বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা.) জনসম্মুখে কয়েক বার বলেছেন : আমি দুটি অতি মূল্যবান এবং ভারী বস্তু তোমাদের মধ্যে রেখে যাচ্ছি। যদি তোমরা এদের পরস্পরকে দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধর তাহলে কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। প্রথমটি হলো আল্লাহর কিতাব কোরআন আর দ্বিতীয়টি হলো আমার ইতরাত ও আহলে বাইত।

কখনোই যেন তোমরা এ দুটি থেকে পিছনে পড়না অথবা অগ্রগামী হয়োনা, কেননা এর মাধ্যমে তোমরা বিপথগামী হয়ে পড়বে।<sup>১৫৬</sup>

৩. আহলে সুন্নাতের বিশিষ্ট আলেম আহমাদ ইবনে হাম্বল বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) আলীকে বলেছেন : তুমি আমার পর আমার পক্ষ থেকে প্রত্যেক মুমিনের প্রতি বেলায়াতের অধিকারী।<sup>১৫৭</sup>

৪.পণ্ডিতগণ এবং হাদীস বিশারদগণ সকলেই বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা.) তাঁর বিদায় হজ্জে গাদীরে খুম নামক স্থানে লক্ষাধিক মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন : আমার মৃত্যু নিকটে এবং অতি শীঘ্রই আমি তোমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছি। অতঃপর আলী (আ.)- এর দুই হাত উঁচু করে বললেন : আমি যার মাওলা আলীও তাঁর মাওলা।<sup>১৫৮</sup>

৫.বহু সংখ্যক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা.) বলেছেন : আমার উত্তরাধিকারীরা কুরাইশদের মধ্য থেকে হবে এবং তাদের সংখ্যা ১২ জন। এমনকি কিছু কিছু হাদীসে ইমামগণের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের নামও বর্ণিত হয়েছে।

উপরোল্লিখিত উদাহরণসমূহ যার কিছু কিছু রাসূল (সা.) তাঁর মৃত্যুর সময় অথবা জীবনের শেষ বয়সে জনগণের কাছে বলেছেন। এগুলো থেকে স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সা.)- এর পর কোন মহান ব্যক্তিত্ব মুসলমানদের কর্তৃত্বকে হাতে তুলে নিবেন।

## পরিষদ এবং ইমামত ও খেলাফত

কিছু লেখক বলেন : ইমামত ও খেলাফত, কমিশন এবং অধিকাংশের ভোটের মাধ্যমে নির্ধারণ করা সম্ভব। এ ব্যাপারে কোরআনের কয়েকটি আয়াত যেখানে বলা হচ্ছে “তোমাদের কার্য ক্ষেত্রে পরামর্শ কর” দলিল হিসাবে ব্যবহার করেছে। তারা এরূপ মনে করে যে, নির্বাচন হলো ইসলামের একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি কিন্তু বোঝেনা যে :

১. ইমামত বিষয়টি হলো নবুওয়াতের পরিসমাপ্তির প্রধান ভিত্তি। নবুওয়াত যেমন নির্বাচনের মাধ্যমে হয়না ইমামতও তেমনি একই মর্যাদার অধিকারী এবং তা নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারিত হতে পারে না।

২. পরামর্শ সেখানে প্রয়োজন যেখানে স্বয়ং আল্লাহ এবং রাসূল (সা.)- এর পক্ষ থেকে কোন কর্তব্য নির্ধারিত হয়নি। যেমনটি আমরা লক্ষ্য করেছি যে, রাসূল (সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পষ্ট ভাষায় নিজের উত্তরাধিকারীকে নির্ধারন করেন। এর পর আর কোন পরামর্শ বা পরিষদের কোন ধারণাই অবশিষ্ট থাকে না।

৩. যদি ধরেও নেই যে, এ ব্যাপারে পরামর্শ করা সঠিক, তাহলে রাসূল (সা.) অবশ্যই তার বৈশিষ্ট বর্ণনা করতেন এবং নির্বাচনকারী ও নির্বাচিত ব্যক্তির শর্তসমূহকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতেন, যার মাধ্যমে জনগণ যে ব্যাপারটি ইসলামী সমাজের অস্তিত্ব এবং উন্নতির প্রধান ভিত্তি ও দীনের অস্তিত্ব যার উপর নিহিত সে বিষয়ে সচেতন ও হুশিয়ার থাকতে পারত। কিন্তু আমরা দেখি যে, এ বিষয়ে তিনি কিছুই বলেন নি। বরং তার বিপরীত বলেছেন। যখন বনি আমের রাসূল (সা.)- এর কাছে আসল তাদের একজন রাসূলকে বলল :

যদি আমরা আপনার সাথে বাইয়াত করি, যার মাধ্যমে আল্লাহ আপনাকে আপনার শত্রুদের উপর বিজয়ী করবেন; সম্ভব কী আপনার পর খেলাফত আমাদের কাছে থাকবে? রাসূল (সা.) বললেন :

খেলাফতের বিষয়টি আল্লাহর হাতে, তিনি তা যেখানে ইচ্ছা সেখানে প্রদান করবেন।<sup>১৫৯</sup>

(الامر الي الله يضعه حيث يشاء)

শিয়ারা উপরোক্ত নিদর্শনসমূহের ভিত্তিতেই বিশ্বাস করে যে, রাসূল (সা.)- এর উত্তরাধিকারীরা, যাদেরকে তিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, তাদের সকলেই আল্লাহর মনোনীত। আরও প্রয়োজন মনে করেন যে, সকল বিষয়ে যারা প্রকৃত ও সুরক্ষিত দীনের অধিকারী তাঁদের অনুসরণ করা একান্ত জরুরী। সৌভাগ্যবশতঃ এই বিশ্বাসের ফলেই তারা মাসুম ইমামগণের সান্নিধ্যে জ্ঞান, হাকিকাত এবং ইসলামী হুকুম আহকামের বহু তথ্য একত্রিত করতে সক্ষম হন। যা জীবনের সর্বস্তরের সমস্যার জবাব দিতে পারে। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে শিয়া মাযহাব একটি সম্ভ্রান্ত মাযহাব হিসাবে পরিগণিত।



## খেলাফতের ঐতিহাসিক পরিক্রমণের সংক্ষিপ্ত চিত্র

রাসূল (সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, তাঁর পর আলী ইবনে আবী তালিবকে তাঁর খলিফা এবং উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করবেন। আর এ মহান বাণীকে জনগণের নিকট পৌঁছে দিতে আদিষ্ট হন।

ইসলাম প্রচারের শুরুতেই নিজের আত্মীয়- স্বজনকে একত্রিত করেন এবং বলেন : আলী হচ্ছে আমার ওয়াসী ও উত্তরাধিকারী। সকলের কর্তব্য হলো তাঁর অনুসরণ করা।<sup>১৬০</sup>

তাবুকের যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে হযরত আলীকে বলেন : তোমার আর আমার সম্পর্ক হারুন এবং মূসার সম্পর্কের অনুরূপ। পার্থক্য হলো আমার পরে আর কোন নবী আসবে না। এটা উত্তম নয় কী যে আমার পর তুমি আমার উত্তরাধিকারী থাকবে।<sup>১৬১</sup>

জীবনের শেষ বছরে বিদায় হজের পর পশ্চিমদে গাদীরে খুম নামক স্থানে লক্ষাধিক জনতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন : আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা এবং অভিভাবক।<sup>১৬২</sup>

অনুরূপ তাঁর শেষ জীবনে জনগণ, সাহাবা এবং বন্ধুদেরকে বলেন : আমি তোমাদের মাঝে দুটি অতি উত্তম ও মূল্যবান বস্তু রেখে যাচ্ছি। একটি আল্লাহর কিতাব অর্থাৎ কোরআন ও অপরটি আমার ইতরাত ও আহলে বাইত। যদি এ দুটিকে দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধর, তাহলে কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না।<sup>১৬৩</sup>

তাছাড়া অসংখ্য রেওয়াজেতের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, মহানবী (সা.) এ বিষয়টিকে বর্ণনা করেছেন। আর এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন যে ইসলামী বিশ্বের নেতৃত্ব স্বাভাবিক ভাবেই আলী (আ.)- এর উপর ন্যাস্ত হবে। এমনকি এ পর্যন্তই তিনি তুষ্ট থাকেননি। তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে বিভিন্ন প্রকার আকর্ষণীয় কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেন যেন যারা ইসলামী খেলাফত লুণ্ঠনের নীল- নকশা এঁটে ছিল তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

উসামার নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনীকে রোমের দিকে প্রেরণ করেন। মদীনার সকল মুহাজির এবং আনসারদেরকে যেমন : আবু বকর, ওমর সকলকেই এ বাহিনীতে অংশ গ্রহণ করার জন্যে

এবং মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়ার আদেশ দেন। কয়েকবার তিনি এ নির্দেশ দান করেছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ ফিরে এলে তিনি পুনরায় তাদেরকে উসামার বাহিনীতে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন।<sup>১৬৪</sup>

রাসূল (সা.) শুধুমাত্র একারণেই মৃত্যু সজ্জায় উসামার নেতৃত্বে মদীনার বাইরে সেনা বাহিনী পাঠিয়ে ছিলেন যেন মদীনা শহর সকল প্রকার বিরোধী তার উপকরণ থেকে মুক্ত থাকে এবং স্বাভাবিক ভাবেই ইসলামী বিশ্বের নেতৃত্ব আলী (আ.)- এর উপর বর্তায়। আর এ জন্যেও যে সকলেই জানুক; নেতৃত্বের শর্ত বার্ষিক্য নয় বরং যোগ্যতাই হলো এর মূল শর্ত। যেন কেউ আলী (আ.)- এর বয়স কম হওয়াটাকে খেলাফতের মর্যাদার জন্যে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার না করে। তাছাড়া অপর একটি কারণ হলো যে, হযরত তাঁর মৃত্যু মুখে কোন প্রকার বিরোধিতা ছাড়াই ওসিয়াত করবেন এবং জনগণের সামনে খেলাফতের লিখিত দলিল রেখে যাবেন।

কিন্তু বিরোধীরা ওসামার বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে মদীনায় ফিরে আসে। রাসূল তাঁর অন্তিম মুহূর্তে কিছু সাহাবাদেরকে বললেন : কাগজ কলম নিয়ে এস, আমি তোমাদের জন্যে এমন কিছু লিখে যেতে চাই যার প্রতি অটল থাকলে কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। কিন্তু তারা হেঁ চৈ করতে লাগল এবং বলল : এই লোক প্রলাপ বলছে, আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। আর এ কথা নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিল।

রাসূল (সা.) এ অন্যায় অভিযোগে খুবই দুঃখিত হন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ পরিস্থিতিতে তার লেখা এ মতভেদকে দূরীভূত করতে পারবে না। এমনকি এ কারণে অনেকে ইসলামের মূলে আঘাত হানতে পারে। এ কারণেই তাদেরকে বললেন : তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাও।<sup>১৬৫</sup>

যারা রাসূল (সা.)- কে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করেছিল, তারা দীনের পরিমাপক সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। অথবা না বোঝার ভান করেছিল এবং সত্যকে মাথা পেতে নিতে চায়নি। কেননা প্রত্যেক মুসলমানই জানে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে সকল প্রকার ক্রটি থেকে রক্ষা করেছেন।

কখনোই এ মহান রাসূলকে প্রলাপ বলছে এ অভিযোগে অভিযুক্ত করা উচিত নয়। পবিত্র কোরআন বলছে :

(وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحي يحيى)

“রাসূল (সা.) নিজের থেকে কিছুই বলেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করা হয়।”

## সকীফা, খেলাফত আত্মসাতের স্থান

১১ হিজরীর ২৮ শে সফর মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেন। মদীনা শোকে নিমজ্জিত হয়। কিছু সংখ্যক মুসলমান, যারা ক্ষমতালোভী এবং পদলোভী ছিল তারা উসামার বাহিনী থেকে ফিরে এসেছিল। আর এরাই মহানবী (সা.)- কে তাঁর অন্তিম ওসিয়ত লিখতে বাধা প্রদান করে। মহানবী (সা.)- এর তিরোধানের পর তারা উত্তম সুযোগ পেয়ে যায় এবং রাসূল (সা.)- এর মৃত দেহ ফেলে রেখে ‘সকীফায়ে বনি সায়েদায়’ একত্রিত হয়।

আনসাররা তাদের দলপতি সা’দ ইবনে আবু ওবাদাকে রাসূল (সা.)- এর উত্তরাধিকারী হিসাবে নির্বাচন করতে চেয়েছিল। কিন্তু আবু বকর এবং ওমর তার বিরোধিতা করে। আবু বকর তার বক্তব্যে মুহাজিরদের মর্যাদা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয় এবং বলে : তারা তোমাদের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তারা রাসূল (সা.)- এর গোত্র (কুরাইশ) হতে। সুতরাং আমির (খলিফা) আমাদের মধ্যে হতে এবং উজির তোমাদের মধ্যে থেকে হবে। অতঃপর মুহাজিরদের মধ্য থেকে একজন বলল : তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে একজন আমির নির্বাচন কর আর আমরা আমাদের মধ্য থেকে একজন আমির নির্বাচন করব। আবু বকর আবারো তাদেরকে বুঝালে তারা মেনে নিল যে মুহাজিরদের মধ্য থেকেই আমির নির্বাচিত হবে। অতঃপর তারা মুহাজির ও আনসারদের অনুপস্থিতিতে সকলের সাথে কোনরূপ আলোচনা এবং তাদেরকে এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত করা ছাড়াই ইসলামের সর্ব সর্বা হয়ে পড়ে। আবু বকর এবং ওমর একে অপরকে খেলাফত গ্রহণের জন্য অনুরোধ করতে থাকে; এমতাবস্থায় ওমর আবু বকরের হাতে বাইয়াত করে।<sup>১৬৬</sup> ওমরের পর যারা চাচ্ছিল না যে, সা’দ ইবনে ওবাদা খলিফা হোক, তারা আবু বকরের হাতে বাইয়াত করে।<sup>১৬৭</sup> তারা একটুও চিন্তা করলনা যে, যদি ফজিলতের মানদণ্ডে রাসূল (সা.)- এর নৈকট্য এবং তাঁর বংশের থেকে হওয়া, হয়ে থাকে; তাহলে আবু বকরের চেয়ে রাসূলের নিকটতম ব্যক্তি রয়েছেন, যিনি এ কাজের জন্য সার্বিক ভাবে সকলের চেয়ে উত্তম। আকস্মিক এ নির্বাচনে সা’দ ইবনে ওবাদা ও তাঁর সমর্থকরা হেরে যায় এবং আবু বকর ও ওমর জয়ী হয়। আরো কিছু সংখ্যক

বিরোধীদেরকে জোর পূর্বক বাইয়াত করতে বাধ্য করে।<sup>১৬৮</sup> অতঃপর আবু বকর ওমর এবং তাদের সমর্থকরা সকীফা থেকে বেরিয়ে মসজিদে নববীর দিকে রওনা করে। পশ্চিমধ্যে কাউকে দেখলে তাকে আবু বকরের সাথে বাইয়াত করতে বাধ্য করে।<sup>১৬৯</sup>

বনি হাশিম এবং মুহাজির ও আনসারদের বিশিষ্ট সাহাবীগণ যেমন : রাসূল (সা.)- এর চাচা আব্বাস, যুবাইর, হাব্বাব ইবনে মুনযার, মেকদাদ, আবু যার গিফারী, সালমান ফারসী, আম্মার ইয়াসির, বারাত ইবনে আযেব, উবাই বিন কাব, উতবা ইবনে আবী লাহাব, খালেদ ইবনে সাঈদ, খুযাইমা ইবনে ছাবিত এবং ফারওয়া ইবনে আমর যারা এ বিষয়ে অবগত ছিলেন না। অকস্মাৎ জানতে পারলেন যে পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। ঘটনা জানতে পেরে তাঁরা খুবই আশ্চর্য বোধ করেন<sup>১৭০</sup> এবং বাইয়াত করেন নি। তারা চিন্তাও করতে পারেন নি যে, এত বেশি রেওয়ায়েত ও স্বয়ং রাসূল (সা.)- এর মনোনয়ন সত্ত্বেও এত শীঘ্র খেলাফত আত্মস্যাৎ করে ফেলবে এবং রাসূল (সা.)- এর পবিত্র আহলে বাইতকে উপেক্ষা করা হবে। সংগত কারণেই সকলে এ অন্যায় এবং ষড়যন্ত্রমূলক বাইয়াতের সরাসরি প্রতিবাদ করেন।

হযরত আলী (আ.)ও আবু বকর ও ওমরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। আবু বকরের সমর্থক আবু উবাইদা বলে, “আলী তুমি এখনো যুবক এবং খেলাফতের জন্য যথেষ্ট অভিজ্ঞতা তোমার নেই।” এর জবাবে আলী (আ.) বলেন : আল্লাহকে ভয় কর, রাসূল (সা.)- এর ইসলামী হুকুমাতকে তার ঘর থেকে নিজেদের ঘরে নিয়ে যেয়ো না এবং এই মর্যদার প্রকৃত অধিকারী থেকে তা আত্মস্যাৎ করনা। হে মুহাজিরগণ (ও আনসার) আমরাই (নবী পরিবার) এবং আমরাই এ খেলাফতের জন্য যোগ্যতম।

তবে কি কিতাব যার আয়ত্বে রয়েছে এবং আল্লাহর দীনের যে ফকীহ। আর মুসলমানদের সার্বিক ব্যবস্থাপনার যে যোগ্য তিনি আমাদের মধ্য হতে নয়? আল্লাহর শপথ! এ খেলাফত আমাদের, প্রবৃত্তির পূজারী হয়ো না। কেননা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে।<sup>১৭১</sup>

সকীফার ঘটনার পর যখন সর্বসাধারণের কাছে বাইয়াত ঘোষণা করা হয়, আলী (আ.) প্রতিবাদের সুরে ঘর থেকে বাইরে আসেন এবং আবু বকরকে বলেন :

আমাদের ন্যায্য অধিকার থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করেছ এবং পরামর্শ করনি। আর সম্পূর্ণরূপে আমাদের অধিকারকে পদদলিত করেছ। আবু বকর বলল : হ্যাঁ কিন্তু ফেৎনা ও বিশৃঙ্খলা থেকে ভয় পেয়েছিলাম। এভাবে হযরত ফাতেমা যাহরা (আ.) যতদিন জীবিত ছিলেন বনি হাশিমের কেউই আবু বকরের নিকট বাইয়াত করেননি।<sup>১৭২</sup>

রাসূল (সা.)- এর তিরোধানের পূর্বে ও পরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে মানুষের সামনে ষড়যন্ত্রের এক বিকট মূর্তি উপস্থিত হয়। আর এ ষড়যন্ত্রের ভিত্তি ছিল ক্ষমতা লিপ্সা এবং নেতৃত্বের লোভ। যদি তাদের কোন উদ্দেশ্যই (ক্ষমতার লোভ) না থাকবে কেন বনি হাশিম এবং রাসূল (সা.)- এর সম্মানিত সাহাবীদেরকে না জানিয়ে গোপনে সক্রীফায় গিয়েছিল? যদি ধরে নেই যে, রাসূল (সা.) কাউকে খলিফা বা উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যাননি; তাহলে কি ইসলামী বিশ্বের ভাগ্য হযরত আলী (আ.) ও তাঁর সাথিরা যেমন : বনি হাশিম এবং সম্মানিত। সাহাবারা যেমন : সালমান, আবু যার এবং মেকদাদের পরামর্শ ব্যতীতই নির্ধারিত হবে?

তারা কি হযরত আলীর চেয়ে বড় চিন্তাবিদ ছিলেন? রাসূল (সা.) কি হযরত আলী সম্পর্কে বলে জাননি যে :

علي مع الحق والحق مع العلي

‘আলী হকের সাথে আর হক আলীর সাথে।’<sup>১৭৩</sup>

علي افضيكم

আলী তোমাদের সবার চেয়ে উত্তম বিচারক?<sup>১৭৪</sup>

انا مد ينة العلم وعلي با بها

আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী তার দরজা।<sup>১৭৫</sup>

হযরত আলী (আ.) কী জ্ঞান ও ফজিলতের প্রাণকেন্দ্র ছিলেন না? তাহলে কেন তাঁর নিকট বাইয়াত করল না, এমনকি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর সাথে পরামর্শ পর্যন্ত করতে রাজি হলো না।

হযরত আলীর বয়স কম হওয়া কি কোন অজুহাত হতে পারে! রাসূল (সা.) যোগ্যতা ও অগ্রাধিকারের মানদণ্ডকে তাকওয়া নির্ধারণ করেছেন। আর উক্ত কারণেই উসামাকে আবু বকরদের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সুতরাং কেন হযরত আলী অন্যদের উপর প্রাধান্য পাবেন না?

যারা এই অজুহাতে যে, আলী (আ.) ইসলামের বিভিন্ন যুদ্ধে অগণিত (কাফেরের) রক্ত ঝরিয়েছেন, তারা তাঁর নিকট নতি স্বীকার করেনি এবং তাঁর খেলাফতের অবাধ্যতা করেছে। তারা আলী (আ.) সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর সকল বাণী ও রেওয়াজকে উপেক্ষা করেছে। ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী যদি কেউ হকের কাছে নতি স্বীকার না করে তাকে বাধ্য করতে হবে, না কি সে হককে উপেক্ষা করবে!

তা ছাড়াও এ অজুহাতের যদি কোন ভিত্তি থাকত এবং তা যদি ঠিক হতো। তাহলে আল্লাহ তায়ালা হযরত আলী (আ.)-কে মনোনীত করতেন না এবং রাসূল (সা.)ও তাঁকে তাঁর উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করতেন না।

**একটি প্রশ্ন :**

কিছু মুসলমান ভাই যারা ন্যায় সংগত বিচার করেন, তারা বলেন :

গাদীরের ঘটনা এবং অন্যান্য অসংখ্য দলিল প্রমাণ যা হযরত আলীর খেলাফতকে প্রমাণিত করে তা অনস্বীকার্য। কিন্তু কেন রাসূল (সা.)-এর তিরোধানের পর আলী (আ.) তাঁর ন্যায় অধিকার রক্ষা করলেন না। অথচ তাঁর খেলাফত কালে যারা তাঁর বিরুদ্ধে উত্থান করত এবং তাঁর হুকুমতকে আত্মসাৎ করতে চাইত, তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করতেন।

**উত্তর :**

হযরত আলী (আ.) আবু বকরের খেলাফতকে অবৈধ মনে করতেন। আর এ কারণেই তার জুমার নামাজে এবং জামাতের নামাজে অংশ গ্রহণ করতেন না। তিনি তাঁর ন্যায় অধিকার ফিরিয়ে নিতে জনগণের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। এমনকি তিনি হযরত ফাতেমা যাহরাকে নিয়ে রাতে আনসারদের বাড়িতে গিয়ে তাদের কাছে সাহায্য চান এবং বলেন : তোমরা আমার অধিকার

ফিরিয়ে নিতে সাহায্য কর। আনসাররা জবাব দিল : আমরা আবু বকরের নিকট বাইয়াত করে ফেলেছি, এখন আর কিছু করার নেই যা হওয়ার তা হয়ে গেছে।<sup>১৭৬</sup>

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, রাসূল (সা.)- এর পর আলী (আ.) সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়ে ছিলেন এবং তাঁর কোন সাহায্যকারী ছিলনা, যাদের মাধ্যমে কিয়াম করবেন। অন্যথায় তিনি তাঁর ন্যায্য অধিকার আদায় করে ইসলামী বিশ্বের নেতৃত্ব দান করতেন। যখন জনগণ ওসমানের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাকে হত্যা করে এবং হতবুদ্ধি হয়ে আলী (আ.)- এর দিকে বাইয়াতের হাত বাড়িয়ে দেয়, তখন আলী (আ.) বললেন : যেহেতু সাহায্যকারী পেয়েছি ইসলামী হুকুমতকে গ্রহণ করাই প্রয়োজন মনে করছি। সুতরাং ইসলামী সমাজের নেতৃত্বকে হাতে তুলে নেন এবং নেতৃত্বদান করেন।<sup>১৭৭</sup>

কিন্তু রাসূল (সা.)- এর তিরোধানের পর যখন দেখলেন কোন সাহায্যকারী নেই এবং এ মুহূর্তে কিয়াম করলে অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য বৃদ্ধি পাবে, যা ইসলামের জন্য কল্যাণকর নয়। কেননা ইসলামের শত্রুরা ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে ওৎ পেতে বসেছিল এবং ইসলাম হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল।

হযরত আলী (আ.) শুধুমাত্র ইসলামের খাতিরে কিয়াম করেননি, কেননা তিনি ইসলামকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসতেন। তিনি চেয়েছিলেন ইসলাম শিকড় গোড়ে বসুক এবং শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করুক ও পুষ্প এবং ফল দান করুক। আলী (আ.) হলেন সেই মহান বীর যিনি সর্বদা রাসূল (সা.)- এর সাথে থেকে ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি যুদ্ধ না করাটাকে ইসলামের জন্য কল্যাণকর মনে করেছিলেন এবং সকল তিক্ততায় ধৈর্য্য ধারণ করে ছিলেন।

আলী (আ.) কখনোই নেতৃত্বের লোভ করেন নি। অন্যথায় তিনি যে কোন উপায়ে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করতে পারতেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যখন আবু সুফিয়ান হযরত আলীকে বলেছিল : “হাত বাড়িয়ে দিন আপনার সাথে বাইয়াত করব, আল্লাহর কসম! যদি চান তাহলে মদীনাকে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যে পরিপূর্ণ করে দিতে পারি। আলী (আ.) তা গ্রহণ না করে বললেন :



আল্লাহর শপথ! তুমি ইসলামের শুভাকাঙ্ক্ষী নও এবং ফেৎনা ফাসাদ করাই হচ্ছে তোমার একমাত্র  
লক্ষ্য। ১৭৮

এ আলোচনায় মনোনিবেশ করার উদ্দেশ্যে এই যে, আমাদের সুন্নী ভাইয়েরা ইতিহাসের এ মহা  
সত্যের উপর (যা তাদেরই নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে) বেশি বেশি অনুসন্ধান  
করবেন। যার মাধ্যমে একে অপরের সহযোগিতা এবং সহমর্মিতায় আমরা পূর্বের তিক্ততার  
ক্ষতিপূরণ করতে পারব এবং নিষ্ঠার সাথে বিশ্বের সকল মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য সৃষ্টির  
পথে সচেষ্ট হতে পারব।

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

## তথ্যসূত্র :

- ১। কোরআনের দলিল অনুসারে সূরা নাহল : ৫৮, ৫৯; সূরা ইসরা : ৩১, তাফসীর আল মিয়ান, ১২তম খণ্ড, পৃ. ২৯৪
- ২। বিহারুল আনওয়ার, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ৩৩১-৩৯৫ এবং সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬-১৬০।
- ৩। বিহারুল আনওয়ার, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ৩৩৬।
- ৪। বিহারুল আনওয়ার, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ১৪২; সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮।
- ৫। সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮০।
- ৬। বসরা ছিল শামের একটি ক্ষুদ্র শহর।
- ৭। লাত ও ওজ্জা হচ্ছে দুটি মূর্তি যাদেরকে আরবরা উপাসনা করত এবং তাদের নামে কসম দিত।
- ৮। সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮১; আলামুল ওয়ারা, পৃ. ২৬; বিহারুল আনওয়ার, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ১৯৩-২০৪।
- ৯। সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৭ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।
- ১০। সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩।
- ১১। বিহারুল আনওয়ার, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ৭৪ ( اخذ بحجة نلت اللابيين الوري )
- ১২। বিহারুল আনওয়ার, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ৭৬ ( ِلوان يوازن احمد )
- ১৩। সূরা নূর : ৩১, ৩২ নং আয়াতানুসারে।
- ১৪। সূরা নূরা : ৩১, ৩২ দ্রষ্টব্য।
- ১৫। বিহারুল আনওয়ার, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ৩; তারিখে ইয়াকুবি, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫।
- ১৬। আইয়ালুশ শিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮; সীরাতে হালাবিয়েহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫২।
- ১৭। সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮, বিহারুল আনওয়ার, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ২২।
- ১৮। বিহারুল আনওয়ার, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ১২; তারিখে তাবারি, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১২৭।
- ১৯। সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮। ঐ পাদটী বোহাইরা ভিন্ন অন্য কেউ ছিল, যে (বোহাইরা) তাঁকে তাঁর শৈশবে দেখেছিল।
- ২০। কামিল, ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯।

- ২১। বিহারুল আনওয়ার, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ২০- ২১।
- ২২। বিহারুল আনওয়ার, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ২০- ২১।
- ২৩। সীরাতে হালাবিয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫২ এবং আয়ানুশ শিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮।
- ২৪। বিহারুল আনওয়ার, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ৫৬- ৭৩।
- ২৫। বিহারুল আনওয়ার, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ১০- ৭১; আইয়ানুশ শিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮।
- ২৬। বিহারুল আনওয়ার, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ৮ ও ১৩।
- ২৭। বিহারুল আনওয়ার, পৃ. ৮ ও ১৩।
- ২৮। ইসলাম আয নাযারে ভল্টার, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫।
- ২৯। ইসলাম আয নাযারে ভল্টার, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৬।
- ৩০। স্যামুয়েল- ২, অধ্যায়- ১১।
- ৩১। হায়াতে মুহাম্মদ (হেকল লিখিত), পৃ. ৩১৫।
- ৩২। মুরজুয যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৭।
- ৩৩। অর্থাৎ আয়েশা।
- ৩৪। মুহাম্মদ ও কোরআন, পৃ. ৩৫।
- ৩৫। সূরা আহযাব : ৩৭।
- ৩৬। সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৫।
- ৩৭। ইসাবাহ ও ইসতিয়াব, পৃ. ৩০৫; মৌসূয়াতুন্নাবী, পৃ. ৩৬৯- ৩৭৪; সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৩; আ'লামুল ওয়ারা, পৃ. ১৪১।
- ৩৮। মৌসূয়াতুন্নাবী, পৃ. ৩৪৫; আ' লামুল ওয়ারা, পৃ. ১৪১।
- ৩৯। বিহারুল আনওয়ার, ২২তম খণ্ড, পৃ. ২০৩; সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃ. ৩৭২; মৌসূয়ায়ে আলে নাবী, পৃ. ৪০৪।
- ৪০। দায়েরাতুল মাআরেফে ইসলামী (এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইসলাম), ফরিদ ওয়াজদী অনুদিত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৫০।
- ৪১। মাজমাযুল বায়ান, ১০তম খণ্ড, পৃ. ৫৩৪ (নতুন সংস্করণ)।
- ৪২। সূরা আনকাবূত : ৪৮।
- ৪৩। বিহারুল আনওয়ার, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ২৮০।
- ৪৪। বিহারুল আনওয়ার, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ২৭৭- ২৮১ এবং নাহজুল বালাগা দ্রষ্টব্য।

- ৪৫। সূরা আলাক।
- ৪৬। ঐংঃবৎরধ হলো এক ধরনের মানসিক রোগ।
- ৪৭। সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৭।
- ৪৮। আলামুল ওয়ারা, পৃ. ৪৭।
- ৪৯। আ'লামুল ওয়ারা, পৃ. ৩৭, কিতাবে জামেয়ে আহাদিসে শিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১। তবে তখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতি ওয়াক্তেই দু'রাকাত করে নামায পড়া হতো।
- ৫০। তারিখে তাবারি, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১২২।
- ৫১। শুয়ারা : ২১৪ وانذر عشيرتک الاقربین তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন কর।
- ৫২। তারিখে তাবারি, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৭১-১১৭৩, তাফসীরে মাজমাউল বায়ান, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২০৬; বিহারুল আনওয়ার, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ১৯২; এ ঘটনাটির মূল বিষয়বস্তুতে ইসলামী ও অনৈসলামিক সকল ঐতিহাসিকের মধ্যে মতৈক্য বিদ্যমান। এ ঘটনাটি একটি প্রমাণিত ঐতিহাসিক ঘটনা বলে পরিগণিত হয়। আল গাদীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৮।
- ৫৩। সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬২; তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯।
- ৫৪। এ বাক্যটি (অর্থাৎ يا صبا حاه) আরবরা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যবহার করত।  
(মাজমাউল বাহরাইন- শব্দ صبح দ্রষ্টব্য)।
- ৫৫। সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৫- ২৬৬, মিশর থেকে প্রকাশিত, ১৩৭৫ হিঃ।
- ৫৬। সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৬- ২৬৭।
- ৫৭। আলামুল ওয়ারা, পৃ. ৫৭।
- ৫৮। মানাকিব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১।
- ৫৯। আলামুল ওয়ারা, পৃ. ৫৮।
- ৬০। কামিল, ইবনে আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৮।
- ৬১। আ'লামুল ওয়ারা, পৃ. ৫৫- ৬১।
- ৬২। তারিখে তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২২৯; আ'লামুল ওয়ারা, পৃ. ৬১- ৬২।
- ৬৩। তারিখে তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৩১; বিহারুল আনওয়ার, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ৬০।
- ৬৪। তারিখে তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৩২; সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮১।

- ৬৫। বিহারুল আনওয়ার, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ৭৮।
- ৬৬। আ'লামুল ওয়ারা, পৃ. ৬৩।
- ৬৭। সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৬; বিহারুল আনওয়ার, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ৬৯।
- ৬৮। সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৯; বিহারুল আনওয়ার, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ৮৮।
- ৬৯। কামিলুত তাওয়ারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৬ (কাবা মক্কার নিকটবর্তী একটি স্থান)।
- ৭০। তারিখে তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৪৫।
- ৭১। বিহারুল আনওয়ার, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ১১৬।
- ৭২। কামিলুত তাওয়ারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৬।
- ৭৩। বিহারুল আনওয়ার, ৭৩তম খণ্ড, পৃ. ২৯৩; রওয়ায়ে কাফী, পৃ. ২৪৬।
- ৭৪। সূরা হুজুরাত : ১০।
- ৭৫। সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০২-৫০৪।
- ৭৬। উসুলে কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৬-১৬৭।
- ৭৭। উসুলে কাফী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৯।
- ৭৮। এবং আমরা তোমাকে বিশ্বাসীর জন্য কেবল রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি (সূরা আশ্বিয়া : ১০৭)।
- ৭৯। আলামুল ওয়ারা, পৃ. ৬৯।
- ৮০। তারিখে তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৭১।
- ৮১। বিহারুল আনওয়ার, ২০তম খণ্ড, পৃ. ৩৫০।
- ৮২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২।
- ৮৩। আলামুল ওয়ারা, পৃ. ১১০।
- ৮৪। কামিল, ইবনে আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৮- ২৪৯।
- ৮৫। উসদুল গাবাহ, ১ম খন্ড, পৃ. ২০৬।
- ৮৬। জাঙ্গ ওয়া সোলহ, পৃ. ৩৪৫।
- ৮৭। বিহারুল আনওয়ার, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ১৪৩।
- ৮৮। মুহম্মাদ সেতারাহ- ই কে দার মাক্কে দেরাখশিদ, পৃ. ৯২।
- ৮৯। বিহারুল আনওয়ার, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ২৬৫- ২৬৬।
- ৯০। কামিল, ইবনে আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৮; আলামুল ওয়ারা, পৃ. ৭৬।
- ৯১। তাবাকাত, প্রথম পাঠ, পৃ. ২৭- ২৯।

- ৯২। তাবারী, ওয় খণ্ড, পৃ. ১৪৬৩- ১৪৭৬।
- ৯৩। মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার ইহুদী গোত্র।
- ৯৪। বিহারুল আনওয়ার, ২০তম খণ্ড, পৃ. ১৯১; তাবারী, ওয় খণ্ড, পৃ. ১৪৭২।
- ৯৫। তাবারী, ওয় খণ্ড, পৃ. ১৪৮৩- ১৪৯৩।
- ৯৬। সিরিয়ার একটি স্থান।
- ৯৭। আলামুল ওয়ারা, পৃ. ১০৪- ১১২; বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ১০৬।
- ৯৮। সাফিনাতুল বাহার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৩।
- ৯৯। সূরা আরাফ : ১৫৮।
- ১০০। সূরা আশ্বিয়া : ১০৭।
- ১০১। সূরা আনআম : ১৯।
- ১০২। কামিল ইবনে আছির খঃ ২ পৃঃ ২১০।
- ১০৩। মাকাতিবুর রাসূল খঃ ১ পৃঃ ৩৫- ৪১ এবং ৯০- ১৮২।
- ১০৪। মাকাতিবুর রাসূল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯০; সীরাতে হালাবী, ওয় খণ্ড, পৃ. ২৭৭।
- ১০৫। মুহাম্মদ ও যামাম দারান, পৃ. ১৬২।
- ১০৬। সীরাতে হালাবী, ওয় খণ্ড, পৃ. ২৮৫।
- ১০৭। মাকাতিবুর রাসূল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭২।
- ১০৮। আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৩।
- ১০৯। জরুরী আইন নিরূপায় অবস্থায়, অসংকীর্ণতা আইন সংকট ও অসুবিধা ক্ষেত্রে অক্ষতি আইন ক্ষতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়ে থাকে। তবে এগুলোর শর্ত ফিকাহ ও উসূলে বর্ণিত হয়েছে।
- ১১০। লিসানুল আরব (لغة) ধাতু দ্রষ্টব্য।
- ১১১। মুফাসসির ও পঞ্জিতগণ অভিধান, আয়াত ও বিশ্বস্ত রেওয়াতের ভিত্তিতে সাধারণ ও বিশেষ ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (ﷺ) শব্দটি রাসূল رسول শব্দের চেয়ে ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়। আগ্রহী পাঠকগণ নিলিখিত কিতাবসমূহে অনুসন্ধান করতে পারেন। জামেউল জাওয়ামে, পৃ. ২৭৫, তাফসীর আল মিয়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪; তাফসীর আল কাশশাফ, ওয় খণ্ড, পৃ. ১৬৪; তাফসীরে বাইযাতী, পৃ. ২৪৭; মাজমাউল বায়ান, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯১; রুহুল মায়ানী, ২২তম খণ্ড, পৃ. ৩২ ইত্যাদি।
- ১১২। দায়েরাতুল মাযারেফ, ফরিদ ওয়াজদী, ওয় খণ্ড, পৃ. ৫৪২।

- ১১৩। আল গাদীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯।
- ১১৪। কামেল, ইবনে আসির, পৃ. ২৪২, ২৭৮, ২১৬।
- ১১৫। তারিখে তারাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৭১- ১১৭৩।
- ১১৬। ফাযায়েলে খামসা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৮- ১৮৬।
- ১১৭। আল গাদীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯- ১১।
- ১১৮। আল গাদীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০- ১১।
- ১১৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬- ১৭৪।
- ১২০। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮- ১৯৯।
- ১২১। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪- ৬১।
- ১২২। আল গাদীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫২- ১৫৭ এ ২৬ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
- ১২৩। আল গাদীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭০- ২৭১।
- ১২৪। আল গাদীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৪।
- ১২৫। সূরা আলে ইমরান : ১৫৯।
- ১২৬। সূরা কালাম : ৪।
- ১২৭। বিহারুল আনওয়ার, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ২২০- ২২৯।
- ১২৮। প্রাগুক্ত।
- ১২৯। কাহলুল বাছার, পৃ. ৬৯।
- ১৩০। বিহারুল আনওয়ার, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ২২৬- ২২৮।
- ১৩১। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০।
- ১৩২। বিহারুল আনওয়ার, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ২২৯, ২৮১- ২৮২।
- ১৩৩। প্রাগুক্ত।
- ১৩৪। কাহলুল বাছার, পৃ. ৬৮।
- ১৩৫। বিহারুল আনওয়ার, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ২২৬- ২৩২।
- ১৩৬। কাহলুল বাছার, পৃ. ৬৭- ৬৮।
- ১৩৭। বিহারুল আনওয়ার, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ২২৮- ২২৯।
- ১৩৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪- ২৬৫।
- ১৩৯। কামিল ইবনে আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫২।

- ১৪০। প্রাণ্ডুক্ত, পৃ. ২৪৮- ২৫২।
- ১৪১। এরশাদুস সারী লি শারহে সহীহ বোখারী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৬।
- ১৪২। ওসয়েল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪২।
- ১৪৩। প্রাণ্ডুক্ত, পৃ. ৪৪৩।
- ১৪৪। সাফীনাতুল বিহার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৯।
- ১৪৫। ওসয়েল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৯।
- ১৪৬। প্রাণ্ডুক্ত, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ৩৭২।
- ১৪৭। প্রাণ্ডুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৪।
- ১৪৮। প্রাণ্ডুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৫।
- ১৪৯। কাহলুল বাছার, পৃ. ৭৮।
- ১৫০। সূরা আহযাব : ২১।
- ১৫১। ২য় খণ্ড, পার্ট ২।
- ১৫২। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইসলাম ও শিয়া মাযহাব নামক বইটি পড়ুন।
- ১৫৩। তাফসীরে আল মিয়ান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১২- ৪২৭।
- ১৫৪। সূরা নিসা : ৫৯।
- ১৫৫। তারিখে তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৭১- ১১৭৩।
- ১৫৬। গায়াতুল মারাম গ্রন্থে একই বিষয়বস্তুর উপর ৩৯টি হাদীস আহলে সুন্নাত থেকে এবং ৮২টি হাদীস শিয়ারা বর্ণনা করেছেন। পৃ. ২১১- ২৩৫।
- ১৫৭। মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩১।
- ১৫৮। এটা অতি প্রসিদ্ধ হাদীস এবং এ সম্পর্কে বহু কিতাব রচিত হয়েছে আরো বেশি জানার জন্য দেখুন মুনতা খাবুল আছার, পৃ. ১০- ১৪১। আল গাদীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ১।
- ১৫৯। সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৪, ১৩৭৫ হিজরীতে মুদ্রিত।
- ১৬০। তারিখে তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৭১- ১১৭৩।
- ১৬১। মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩১।
- ১৬২। আল গাদীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ১।
- ১৬৩। গায়াতুল মারাম, পৃ. ২১১- ১৩৫।



- ১৬৪। তাবাকাতে কাবীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬; শারহে নাহজুল বালাগা, ইবনে আবিল হাদীদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৯-১৬০।
- ১৬৫। তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬-৩৮; সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৫-৭৬।
- ১৬৬। তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৩৯-১৮৪৩।
- ১৬৭। শারহে নাহজুল বালাগা, ইবনে আবিল হাদীদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০।
- ১৬৮। তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৪০।
- ১৬৯। শারহে নাহজুল বালাগা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৯।
- ১৭০। ফুসুলুল মুহিম্বাহ, পৃ. ৪১-৪২।
- ১৭১। শারহে নাহজুল বালাগা, ইবনে আবিল হাদীদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১১-১৩।
- ১৭২। মুরুযুয যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০১।
- ১৭৩। তারিখে বাগদাদ, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৩২১।
- ১৭৪। ফাযায়েলুল খামসা মিনাস সিহাহ্‌স সিভাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬২।
- ১৭৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০।
- ১৭৬। শারহে নাহজুল বালাগা, ইবনে আবিল হাদীদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩।
- ১৭৭। নাহজুল বালাগা, ফাইয়ুল ইসলাম, খুৎবা নং- ৩, পৃ. ৩৭-৪৩।
- ১৭৮। কামিল, ইবনে আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৬।

## সূচিপত্র

ইসলাম পূর্ব বিশ্ব .....	4
ইসলামের আবির্ভাবের প্রাক্কালে আরব ভূ-খণ্ড.....	6
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম ও শৈশব.....	9
মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন এক বিস্ময়কর নবজাতক.....	11
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দুঃসমাতা হালিমা.....	12
ঘটনার ঘন ঘটায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) .....	14
মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টান্ত মূলক বিশেষত্ব.....	14
মহানবীর শৈশব ও যৌবনের স্মৃতি কথা.....	16
বোহাইরার সাথে হযরত মুহাম্মদের সাক্ষাৎ .....	18
রাখালী ও মহানবী (সা.)-এর চিন্তা-চেতনা.....	20
মহানবী (সা.)-এর সততা.....	21
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রথম বিবাহ .....	23
হযরত খাদিজার পরামর্শ.....	24
খাদিজা কে?.....	25
শামের পথে যাত্রা.....	26
বিবাহের প্রস্তাব .....	28
খ্রিস্টানগণ কর্তৃক অপবাদ প্রদানের কয়েকটি দৃষ্টান্ত .....	30
ইতিহাসের বিচার.....	32

ছিদ্রান্বেশীদের নিকট প্রশ্ন . . . . .	33
রাসূল (সা.)-এর স্ত্রীর সংখ্যা . . . . .	34
নবুওয়াত লাভের পূর্বে মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিত্ব . . . . .	38
ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবের পরিবেশ . . . . .	39
নবীগণ (আ.) সমাজ গঠন করতেন, সমাজের অনুসরণ করতেন না . . . . .	41
হাজারুল আসওয়াদ স্থাপনের ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সিদ্ধান্ত . . . . .	43
ওহীর অবতরণ . . . . .	45
মুহাম্মাদ (সা.)-এর বিশ্বজনীন রেসালত . . . . .	46
চল্লিশ বছর বয়সে হযরত মুহাম্মদ (সা.) . . . . .	47
ওহী কী? . . . . .	49
ওহী কি এক ধরনের অসুস্থতা? . . . . .	50
ওহী ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান . . . . .	52
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রচার পদ্ধতি . . . . .	53
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অপেক্ষায় খাদিজা . . . . .	54
বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে হযরত আলী (আ.) ছিলেন প্রথম পুরুষ . . . . .	55
নামাযের আদেশ . . . . .	56
তিন বছর যাবৎ কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রচার . . . . .	57
নিকটাত্মীয়দেরকে নিমন্ত্রণ ও প্রথম মুজিয়াহ . . . . .	59

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সর্বজনীন প্রচার কার্য . . . . .	61
সাফা পর্বতে মহানবীর বক্তব্য. . . . .	62
মহানবী (সা.)-এর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া. . . . .	64
কোরাইশদের হযরত আবু তালিবের নিকট অভিযোগ. . . . .	65
কোরাইশ কর্তৃক লোভ প্রদর্শন. . . . .	67
চলার পথে প্রতিবন্ধকতা এবং কুরাইশদের নির্যাতন . . . . .	69
হিজরতের ঘটনা প্রবাহ. . . . .	73
মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র . . . . .	75
আলী (আ.)-এর আত্মত্যাগ . . . . .	76
রাসূল (সা.) সাউর গুহায় . . . . .	77
ইয়াসরেব (মদীনা) অভিমুখে যাত্রা . . . . .	78
ইয়াসরেব (মদীনা) রাসূলের প্রতীক্ষায় . . . . .	79
হিজরতের শিক্ষা. . . . .	80
মদীনায় ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের গোড়াপত্তন . . . . .	81
ইসলামে ভ্রাতৃত্ব বোধ স্থাপনে মহানবী (সা.)-এর বিরল কৃতিত্ব . . . . .	82
ইসলামী ভ্রাতৃত্ব (ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের ধ্বনি) . . . . .	83
বর্তমান যুগে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব. . . . .	85
ইসলামে জিহাদ . . . . .	86

কিসের জন্যে জিহাদ? .....	87
ইসলামের অগ্রগতি কি তববারীর সাহায্যে হয়েছে?! .....	89
রাসূল (সা.)-এর সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধ .....	91
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিশ্বজনীন রেসালত .....	97
বিভিন্ন দেশের বাদশা এবং গোত্রপতিদের কাছে প্রেরিত পত্র .....	100
ইরান সম্রাটের প্রতি প্রেরিত পত্র .....	101
রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি প্রেরিত পত্র .....	102
ইয়ামামার শাসকের উদ্দেশ্যে প্রেরিত পত্র .....	103
ইহুদীদের প্রতি .....	104
নাজরানের পাদ্রীকে .....	105
ইসলাম প্রচারে আমাদের দায়িত্ব .....	106
হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ নবী .....	107
ইসলাম এক চিরন্তন দীন .....	109
কোরআনের দৃষ্টিতে নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি .....	111
হাদীসের দৃষ্টিতে নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি .....	112
হাদীসে গাদীর এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর স্থলাভিষিক্তি	Er r or !      Bookmar k
not def i ned.	
হাদীসে গাদীরের বর্ণনাকারীগণ .....	118
হাদীসে গাদীরের তাৎপর্য .....	119

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য .....	121
সর্বসাধারণের মধ্যে মহানবী (সা.) .....	124
মহানবী (সা.)-এর মহত্ব ও মহানুভবতা.....	126
মহানবী (সা.) ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা .....	127
মহানবী (সা.)-এর ধার্মিকতা ও ইবাদত.....	128
রাসূল (সা.)-এর উত্তরাধিকারী ও খেলাফত .....	129
রাসূল (সা.) কি তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন?.....	133
পরিষদ এবং ইমামত ও খেলাফত .....	135
খেলাফতের ঐতিহাসিক পরিক্রমণের সংক্ষিপ্ত চিত্র .....	137
সকীফা, খেলাফত আত্মসাতের স্থান.....	140
তথ্যসূত্র : .....	146